নিরীক্ষা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৪৩তম সংখ্যা

পরিবেশ জলবায়ু ও উপকূলবিষয়ক সাংবাদিকতা

নিরীক্ষা

২৪৩তম সংখ্যা: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২

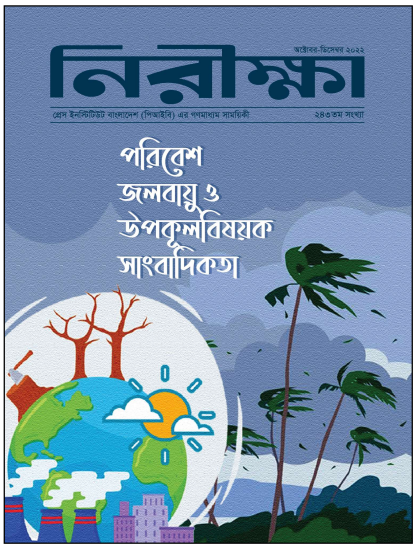

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে হুমকির সম্মুখীন আজ সারা বিশ্ব। এই হুমকি মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার কোনো বিকল্প নেই, এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়–সবাইকে একযোগে দাঁড়াতে হবে বিপর্যয় রুখতে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম রাখতে পারে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা। জনমত গঠনের পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট সব মহলকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করতে গণমাধ্যমের যে প্রভাব, এর পুরোটাই ব্যবহার করতে হবে এই লক্ষ্যে–এটা সময়ের দাবি। আর সেটি করতে হলে চাই বিষয়টির বিস্তৃতি নিয়ে পরিষ্কার ধারণা। কেবল সংকটের কথা বলাই যথেষ্ট নয়, একজন গণমাধ্যমকর্মী সংকট উত্তরণের পথ দেখাবেন, সেটাও প্রত্যাশা। কেবল এটুকু যথেষ্ট নয়, এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী পক্ষগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। স্বার্থান্বেষী মহলের অপব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত না হয়ে প্রকৃত তথ্য তুলে আনতে হবে বিজ্ঞানের আলোকে। বলতে হবে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কথা, 'ক্লাইমেট জাস্টিস'-এর কথা। এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে আজ আন্তর্জাতিক ফোরামে অন্যতম প্রধান কণ্ঠ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়াও তাঁর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এই বিপর্যয় মোকাবিলায় নিয়েছে নানান উদ্যোগ। সেই উদ্যোগগুলোর সাফল্যে গণমাধ্যমকে পাশে থাকতে হবে।

আমাদের এখানে পরিবেশ, জলবায়ুবিষয়ক সাংবাদিকতার শুরু আশির দশকে। যদিও গুরুত্বানুসারে এর বিকাশ সেভাবে ঘটেনি। এখানে গণমাধ্যম কর্তৃপক্ষের দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। আর উপকূল তো প্রবল দুর্যোগে শিরোনাম হওয়া ছাড়া সব সময়ই রয়ে গেছে অবহেলিত। আশার কথা এই–সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যমগুলো পরিবেশ, জলবায়ু ও উপকূল বিষয়ে আগের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেদন, ফিচার, মতামত প্রকাশ করছে। অগ্রজদের দেখানো পথ ধরে একঝাঁক নিবেদিতপ্রাণ সংবাদকর্মী নিরলস কাজ করছেন নিখাদ আন্তরিকতায়। তাদের সেই প্রচেষ্টার ইতিবাচক প্রভাবও দৃশ্যমান। তবে এখনই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সুযোগ নেই–যেতে হবে অনেক দূর। জাতিসংঘ মহাসচিব যেমনটা বলেছেন, 'The climate emergency is a race we are losing, but it is a race we can win.' এই লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে। মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষায় এই লড়াইয়ে বিজয়ের বিকল্প নেই। বিশ্বাস করি, আমাদের গণমাধ্যমকর্মীরা সম্মুখসারিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিবেন এই লড়াইয়ে–আমাদের পৌঁছে দিবেন বিজয় বন্দরে।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূ|চি|প|ত্র

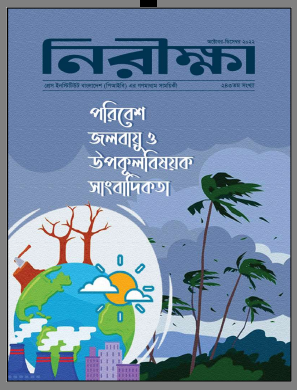

গ্লাসগো জলবায়ু চুক্তি অনুসরণ করার এখনই সময় ৩
শেখ হাসিনা

সংবাদপত্রে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ: মৌলিক ধারণা ৫
শুভ কর্মকার

উপকূল সাংবাদিকতা: বিষয় ❑ কলাকৌশল ❑ চ্যালেঞ্জ ১৪
রফিকুল ইসলাম মন্টু

পরিবেশ ও জলবায়ুসংক্রান্ত সাংবাদিকতার শুরুর কথা ২৩
মিনহাজ উদ্দীন

উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটি রেডিয়ো: একটি পর্যবেক্ষণ ২৫
মামুন আ. কাইউম

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ ও গণমাধ্যমের করণীয় ২৮
আবুজার

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক প্রতিবেদনে করণীয় ৩২
পপি দেবী থাপা

আমাদের উন্নয়ন ভাবনায় জল ও জলাভূমি ৩৫
মোহাম্মদ এজাজ

৪০ পরিবেশ রক্ষায় ও দূষণের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে
মনোয়ার হোসেন

৪২ পরিবেশ ও উন্নয়ন সাংবাদিকতা
কামরুল ইসলাম চৌধুরী

৪৫ বিকশিত হোক পরিবেশ সাংবাদিকতা
ড. হারুন রশীদ

৫০ গ্রিনহাউজ গ্যাস, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভুক্তভোগী বাংলাদেশ
মাহফুজুর রহমান মানিক

৫৪ জলবায়ু পরিবর্তন, চুক্তি ও বৈশ্বিক উদ্যোগ
কামনা আক্তার ❑ মাসুম বিল্লাহ আরিফ

৫৯ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত
জাফর ওয়াজেদ

৬১ গণমাধ্যম সংবাদ

৭২ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ৪০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

প্রবন্ধ

গ্লাসগো জলবায়ু চুক্তি অনুসরণ করার এখনই সময়

শেখ হাসিনা

মানব ইতিহাসের অন্য কোনো সময় জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার চেয়ে জরুরি কোনো কারণ প্রমাণিত হয়নি; এই গ্রহ, আমরা যাকে বাড়ি বলে ডাকি এবং যা আমরা প্রতিটি প্রজাতির সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছি, সেখানে আমাদের এর চেয়ে আর কোনো বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয়নি।

যাই হোক, উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা এবং অনুপ্রেরণাদায়ক ভাষা এখন শুধু শূন্য অনুভূতি। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল ধরে জোরদার পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েও খালি অলংকার ছাড়া আর কিছুই পাননি।

এক শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি বাংলাদেশের সিলেটের মানুষের কাছে শব্দগুলো পর্যাপ্ত নয়। শব্দগুলো আকস্মিক বন্যাকে তাদের বাড়িঘর নিয়ে যাওয়া, তাদের জীবিকা ধ্বংস করা, তাদের প্রিয়জনকে হত্যা করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি এবং গত মাসে পাকিস্তানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩৩ মিলিয়ন মানুষের জন্য সমর্থন বা ছোটো সাহায্য প্যাকেজগুলোর টুইটগুলো যথেষ্ট ছিল না। এর পরিবর্তে আমি আজ যা আহ্বান করছি তা হলো পদক্ষেপ–গত বছর গ্লাসগোতে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে কপ২৬-এ দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য পদক্ষেপ, একটি উষ্ণ গ্রহের কঠোরতম বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় আমার মতো দেশগুলোকে সহায়তা করার জন্য। যখন বিশ্বনেতারা আবারও একত্র হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন–এবার শারম আল শেখ-এ আমি আমার সম্মানিত সহকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, তাঁরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রক্ষার উপায় খুঁজে বের করার জন্য। অন্তত পক্ষে ২০২৫ সালের মধ্যে অভিযোজনের পাশাপাশি অর্থের ব্যবস্থা দ্বিগুণ করার জন্য।

উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুত আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তিকে একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং এটি আমার মতো জলবায়ুর ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য অত্যাবশ্যক। এটি ভবিষ্যতের কোনো তারিখের জন্য ছেড়ে দেওয়া যাবে না। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের বিস্তৃত পরিণতির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি এবং এই মুহূর্তে যদি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়, তাহলে অবিলম্বে সহায়তা দেওয়া দরকার।

বাংলাদেশ বর্তমানে বৈশ্বিক কার্বন নির্গমনে ০.৫৬ শতাংশ অবদান রাখে, তবু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের দেশের ক্ষতির অনুপাত অপ্রতিরোধ্য। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় ক্ষয়, খরা, তাপ এবং বন্যা–সবই আমাদের অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। তারা আমাদের অবকাঠামো এবং কৃষিশিল্পকে ধ্বংস করবে, কারণ আমরা চরম এবং ধীরগতির ঘটনাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষয়ক্ষতি এবং ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ, হ্রাস ও মোকাবিলায় যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মানবসৃষ্ট উষ্ণায়নের কারণে আমাদের জিডিপি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে বলে আশঙ্কা আশা করা হচ্ছে এবং গড় আয় ২১০০ সালে ৯০ শতাংশ কম হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। আন্তসরকারি প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে ধারণা করা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্য প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

এ ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পূর্বাভাসের মুখোমুখি হলে হতাশাগ্রস্ত হওয়া সহজ হবে, যখন জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান অনেকের কাছে শোনা যাচ্ছে না এবং অগ্রগতিও খুব ধীর। উদ্‌বেগের পক্ষাঘাতে আত্মহত্যা করা অনেক সহজ হবে–তবে আমাদের অবশ্যই তা প্রতিরোধ করতে হবে। আর বাংলাদেশে আমরা সেটাই করছি।

এ ধরনের গুরুতর হুমকির মুখে আমরা এখন পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে প্রাণবন্ত এবং ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলো মোকাবিলা করার জন্য আমরা মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনাও উন্মোচন করেছি, আমাদের শক্তি নেটওয়ার্ককে ডিকার্বনাইজ করা থেকে শুরু করে সবুজ বিনিয়োগের উদ্যোগ–বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে উভয় ক্ষেত্রে আমাদের গতিপথকে ক্ষতিকর প্রভাবের পরিবর্তে সমৃদ্ধিশালী করবে।

আমরা ছিলাম উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রথম, যারা ২০০৯ সালে একটি বিস্তৃত জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম। এখন পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন অভিযোজন এবং প্রশমন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৪৮০ মিলিয়ন বরাদ্দ করেছি।

বর্তমানে আমরা আমাদের উপকূলীয় জেলা কক্সবাজারে জলবায়ু উদ্‌বাস্তুদের জন্য একটি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। এই প্রকল্পে প্রায় পাঁচ হাজার জলবায়ু উদ্‌বাস্তু পরিবারকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ১৩৯টি বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। আমার ১৮ বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বে আমার সরকার আজ পর্যন্ত প্রায় ৩৫ লাখ মানুষকে বাড়ি দিয়েছে। এরই মধ্যে আমরা 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' গ্রহণ করেছি; যার লক্ষ্য একটি নিরাপদ, জলবায়ু-সহনশীল এবং সমৃদ্ধ বদ্বীপ গঠন করা। প্রতিবছর আমার দল আমাদের দেশের গাছের পরিধি বাড়াতে লাখ লাখ চারা রোপণ করে।

ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ) এবং ভি-২০-এর সাবেক চেয়ার হিসাবে বাংলাদেশ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর স্বার্থের প্রচারে মনোনিবেশ করে চলেছে। শুধু বেঁচে থাকাই যথেষ্ট নয়; আমরা সফল হতে চাই। একজন বিশ্বনেতা হতে চাই, আমাদের প্রতিবেশী এবং বিশ্বকে দেখাতে চাই যে এখনো একটি আশাপূর্ণ ভবিষ্যতের পথ রয়েছে; কিন্তু আমরা একা এটি করতে পারি না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কথাগুলোকে অবশ্যই কাজে পরিণত করতে হবে।

গ্লাসগোতে অভিযোজন তহবিল ৪০ বিলিয়ন ডলার বাড়াতে সম্মত হওয়াকে অবশ্যই আমাদের অভিন্ন ভবিষ্যতের প্রাথমিক বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। অন্যথায় নিষ্ক্রিয়তার খরচ অপরিসীম হবে। গত বছরের আইপিসিসি ওয়ার্কিং গ্রুপ দ্বিতীয় রিপোর্ট এরই মধ্যে সতর্ক করেছে যে–২১০০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী জিডিপি ক্ষতি ১০ থেকে ২৩ শতাংশ হতে পারে, যা আগের পূর্বাভাসের চেয়ে অনেক বেশি।

আমরা ছিলাম উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রথম, যারা ২০০৯ সালে একটি বিস্তৃত জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম। এখন পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন অভিযোজন এবং প্রশমন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৪৮০ মিলিয়ন বরাদ্দ করেছি

প্রতিটি পেরিয়ে যাওয়া বছর ২১ শতকে আমাদের গ্রহের গভীরভাবে আন্তসংযুক্ত প্রকৃতিকে আরও শক্তিশালীভাবে হাইলাইট করে; সরবরাহ লাইন এবং শক্তিনির্ভরতা আমাদের সবার ওপরে একটি দীর্ঘ ছায়া ফেলে। এ বছর এরই মধ্যে বিশ্বজুড়ে আরও রেকর্ড-ব্রেকিং তাপমাত্রার ঘটনা নিয়ে এসেছে, রেকর্ড করা ইতিহাসে প্রথমবারের মতো যুক্তরাজ্যে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন, ক্ষতি এবং ধ্বংস এরই মধ্যে আমাদের সঙ্গে আছে, আমরা যেদিকে তাকাই না কেন, এটি বিশ্বজুড়ে অসংখ্য উপায়ে চলছে এবং আমাদের মতো জলবায়ু-সংবেদনশীল দেশগুলোর মুখোমুখি সমস্যাগুলো খুব শিগগিরই অন্যান্য জাতির দ্বারস্থ হবে।

আমাদের যদি এই বড়ো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার কোনো আশা থাকে, তাহলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বাংলাদেশে বন্যা, ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানল, ইউরোপের খরা, তাপমাত্রা ১.২ ডিগ্রি বৃদ্ধি–সবই পরস্পর সংযুক্ত এবং আমাদের অবশ্যই একসঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

গত বছর দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করতে হবে, তাহলেই শুধু প্রতিশ্রুতিগুলো অবশেষে কর্মের দিকে পরিচালিত করবে।

লেখক: প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[লেখাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'পলিটিকো' পত্রিকায় ৬ নভেম্বর প্রকাশিত]
সূত্র: বাসস

সংবাদপত্রে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ: মৌলিক ধারণা

শুভ কর্মকার

১.১ প্রারম্ভিক আলোচনা

একবিংশ শতাব্দী। নতুনের আগমনে নতুন কিছু পাওয়ার আশায় পৃথিবীর মানুষ। কালের পরিক্রমায় মানুষের এমন চাহিদা অমূলক নয়। কিন্তু সব চাহিদাকে পাশ কাটিয়ে একটি খবরে সরব পৃথিবী। চারিদিকে একটাই আলোচনা, একটাই কথা–'জলবায়ু পরিবর্তন'। আলোচনায় দুটি পক্ষ দেখা যাবে, এটাই স্বাভাবিক। 'জলবায়ু পরিবর্তন'-বিষয়ক আলোচনাও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানেও আমরা দুটি দল দেখতে পাই। জলবায়ু পরিবর্তিত হবে এটিই স্বাভাবিক, এটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই। আসলে যারা এটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে, তারা নিজেদের স্বার্থেই এটি করছে। এতে বিভ্রান্ত হচ্ছে বিশ্ব। জলবায়ু পরিবর্তনকে এক পক্ষ এভাবেই উপস্থাপন করছে। অন্যরা বলছে, কিছু স্বার্থন্বেষী মানুষের অতি অর্থলোভের কারণে পৃথিবী আজ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের সম্মুখীন। প্রকৃতিকে অপরিমিতভাবে শোষণের কারণেই প্রকৃতির এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া। এজন্য পৃথিবীর মানুষই দায়ী। এ কথা সত্য যে, সময় যেমন বসে থাকে না, তেমনই জলবায়ু তার নিজ অবস্থানে স্থির থাকে না। এটা সর্বদা পরিবর্তনশীল (Burroughs, 2001, P.1)।

বিশ্ব ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে এমনটাই দেখা যায়। খ্রি. পূ. ৯০০০-৬০০০ অব্দে দেখা যায়, পৃথিবী উষ্ণ ও শুষ্ক, খ্রি. পূ. ৬৮০০-৫৬০০ অব্দে শীতল ও আর্দ্র, খ্রি. পূ. ২৫০০-৫০০ অব্দে উষ্ণ ও শুষ্ক, ৫৯০-৬৪৫ খ্রি. খরা, ৮০০ খ্রি. কৃষ্ণসাগর বরফ, ৮২৯ খ্রি. নীল নদে বরফ এবং ১২২০-১২৯০ খ্রি. আবার খরা দেখা দেয় (Sellers, 1972, p. 206-207)। ইতিহাস বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনশীল। তাহলে এটা নিয়ে এত মাতামাতি কেন? মাতামাতির কারণ রয়েছে। বিশ্ব জলবায়ুর স্বাভাবিক পরিবর্তন এখন আর দেখা যাচ্ছে না। পরিবর্তনের মাত্রা খুব বেশি। তাই এত আলোচনা। আর এ দ্রুত পরিবর্তনের জন্য দায়ী করা হচ্ছে সেসব দেশকে, যারা প্রকৃতিকে অপরিমিত বা বেহিসাবিভাবে শোষণ করছে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ও জীবনধারা মানুষ ও প্রকৃতিকে নির্মমরূপে যথাসম্ভব শোষণ করে জলবায়ুতে যে পরিবর্তন সূচিত করেছে, তা আজ সংকট হিসাবে সারা পৃথিবীতে মানুষসহ সব প্রাণের প্রতি হুমকি হিসাবে দেখা দিয়েছে (চৌধুরী, ২০১১)। শোষণের প্রভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে একশ্রেণির মানুষ। সমাজে বাড়ছে বৈষম্য। শ্রেণিবৈষম্যই নয়, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় করণীয় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে বিশ্বপরিধিতে বৈষম্যের প্রকাশ: অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিধর দেশগুলো সব সময় সব ধরনের চেষ্টা করেছে গরিব দেশগুলোর ওপর বোঝা চাপিয়ে দিতে, মুনাফা তৈরির হার না কমানোর উদ্দেশ্য কোনো ধরনের আপস বা সমঝোতায় উপনীত হওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছুক থাকতে (চৌধুরী, ২০১১)।

একদিকে একটি শ্রেণি যেমন শোষণের শিকার হচ্ছে, তেমনই সমানতালে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হচ্ছে অন্য শ্রেণিটি। সমাজের এই বৈষম্যমূলক অবস্থান থেকে সমাজের প্রত্যেক সচেতন মানুষের একটা দায় থেকে যায়। এই দায়ের জায়গা থেকেই আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে জলবায়ু পরিবর্তন। চিন্তা কাঠামোতে যুক্ত হয়েছে একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে। তাই মানুষের পাশাপাশি সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়। তেমনই সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংবাদপত্রের দায় কিছুটা বেশি। কেননা সংবাদপত্রকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। সমাজের সংকটে তাকেই তো এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকির অন্যতম দেশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা বলার অপেক্ষা রাখে না।

জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকির ক্ষেত্রে বংলাদেশ সম্পর্কে আশঙ্কা এমন–দেশের বৃহৎ অংশ কোনো একসময় সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনকে ঘিরে বাংলাদেশ সম্পর্কে এ সংকটের আশঙ্কা অমূলক নয়। তাই ভয়াবহ বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়ার আগেই প্রয়োজন প্রতিরোধ। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে সবার আগে অবদান রাখতে পারে গণমাধ্যম। মানুষের মাঝে জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন রোধে এর পরিবর্তনে দায়ীদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে গণমাধ্যম এ সমস্যা সমাধান করতে পারে। গণমাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্র জোরালো ভূমিকা পালন করবে, এটাই স্বাভাবিক।

১.২ জলবায়ু ও আবহাওয়া

'একা এসেছি, একা চলে যাব'–এ কথা বলে তারাই, যাদের নিজের জীবন সম্পর্কেও ধারণা নেই (মুহাম্মদ, ২০১০, পৃ. ১১)। কারণ আমাদের বেড়ে ওঠাই শুধু মানুষের সহায়তায় না, বরং জন্মগ্রহণ প্রক্রিয়াটাও দুজন মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া অসম্ভব। মানুষ ছাড়া যেমন কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করতে পারে না, তেমনই অনুকূল পরিবেশ ব্যতীত কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করা প্রতিটি মানুষ অনন্য, এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তেমনই আমরা যে পরিবেশে বাস করি, সেই পরিবেশের প্রতিটি মুহূর্ত অনন্য। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্তিত হতে থাকে সেই পরিবেশের অবস্থা। যেমন: কখনো যদি রোদের তীব্রতা দেখতে পাই তো আবার কখনো মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। এভাবে শীত, বৃষ্টি, গরম, ঝড় প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলের অবস্থা পরিবেশকে অনন্য করে তোলে।

অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে আমরা প্রতিদিনই একধরনের পরিবর্তন দেখতে পাই। আমরা বায়ুমণ্ডলে যে ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাই, এর সংমিশ্রণই হলো আবহাওয়া। অর্থাৎ আবহাওয়া ও বায়ুমণ্ডল অনেকটাই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। বিষয়টি পরিষ্কার হবে বায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াকলাপ থেকে। বায়ুমণ্ডল কীভাবে আমাদের পরিবেশকে প্রভাবিত করে থাকে, এ বিষয়ে জানলেই আবহাওয়া বিষয়ে অনেকটাই পরিষ্কার হওয়া যাবে।

প্রথমেই বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে ধারণা নেওয়া প্রয়োজন। সহজভাবে বায়ুমণ্ডল বলতে বোঝায়–আমাদের পৃথিবীকে বেষ্টন করে যে বায়বীয় পদার্থ রয়েছে, তাই বায়ুমণ্ডল। পৃথিবী থেকে ২৫০০ মাইল উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুর অস্তিত্ব রয়েছে। যাকে আমরা বায়ুমণ্ডল বলি। এই বায়ুমণ্ডল তেমন কিছুই নয় বরং কতিপয় গ্যাসের মিশ্রণ। মূলত নিম্নোক্ত গ্যাসের মিশ্রণেই আমাদের বায়ুমণ্ডল গঠিত। গ্যাসগুলো হলো: নাইট্রোজেন ৭৮.০৮%, অক্সিজেন ২০.৯৪%, আর্গন ০.৯৩%, কার্বন ডাইঅক্সাইড ০.০৩%, নিয়ন ০.০৩১৮%, হিলিয়াম ০.০০০৫%, ওজোন ০.০০০০৬%, হাইড্রোজেন ০.০০০০৫% (Barry and Chorley, 1972, p. 22)। বায়ুমণ্ডলের এই উপাদানগুলো ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫৫ মাইলের মধ্যে থাকে। এখানে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়াও অতি সামান্য পরিমাণে জলকণা, ধূলিকণা ও লবণকণা বাতাসে রয়েছে। পরিমাণের দিক দিয়ে জলকণা, ধূলিকণা ও লবণকণা অতি অল্প হলেও আবহাওয়া ও জলবায়ুর দিক দিয়ে অতিগুরুত্বপূর্ণ। এ তিনটি উপাদান পৃথিবী থেকে বিকীর্ণ তাপের অতি উৎকৃষ্ট শোষক এবং বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা অতিগুরুত্বপূর্ণ। ধূলিকণা, লবণকণা ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ পৃথিবীর সর্বত্র সব সময় এক থাকে না। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এবং এক সময় থেকে অন্য সময়ে এদের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে যতই ওপরে ওঠা যায়, ততই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমতে থাকে। ট্রাপোস্ফিয়ারের ওপরে জলকণা একেবারেই নেই। আবার জলরাশি ও বনভূমির ওপরে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ মরুভূমি অপেক্ষা বেশি। শুষ্ক স্থলভাগ এবং মরুভূমি অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলে সমুদ্র ও বনভূমি অঞ্চল অপেক্ষা ধূলিকণার পরিমাণ বেশি। আবার স্থলভাগ অপেক্ষা সমুদ্রের ওপরের বায়ুতে লবণকণার পরিমাণ অনেক বেশি। অর্থাৎ এই তিনটি উপাদান বায়ুমণ্ডলের নিয়ামক।

এ বায়ুমণ্ডলে পরিবর্তন সৃষ্টি করা সব ঘটনার মিশ্রণই হলো আবহাওয়া। সাধারণভাবে বলা যায়, আবহাওয়া হলো বায়ুমণ্ডলে কয়েকদিনের তাপমাত্রা, মেঘাচ্ছন্নতা, আর্দ্রতার অবস্থান (What's the difference between weather and climate)। রফিক আহমেদ এ সম্পর্কে বলেন, 'কোনো স্থানের অল্প কয়েকদিনের (একদিন, দুইদিন, বা বড়োজোর এক সপ্তাহের) বায়ুর মৌলিক উপাদানগুলোর সমষ্টিকে আবহাওয়া বলে (আহমেদ, ১৯৮২, পৃ. ৮)। যেমন: গতকাল ঢাকার আবহাওয়া শুষ্ক ছিল। আবহাওয়া বলতে বায়ুমণ্ডলের অস্থায়ী অবস্থাকে বোঝায়। প্রতিদিন রেডিয়ো, টেলিভিশনে বায়ুমণ্ডলের যে পূর্বাভাস বা অবস্থা জানানো হয়, তাই আবহাওয়া। এটা পৃথিবীর সর্বত্র একরকম থাকে না বরং এটা কোনো স্থানে রোদ তো অন্য স্থানে বৃষ্টি হয়। এটাই আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য।

কোনো স্থানের বা অঞ্চলের ২০ থেকে ৩০ বছরের দৈনন্দিন আবহাওয়া পর্যালোচনা করলে যে সাধারণ অবস্থা দেখা যায়, তাকে ওই স্থান বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে (আহমেদ, ১৯৮২, পৃ. ৮)। মনে রাখা প্রয়োজন, জলবায়ু হলো দৈনন্দিন আবহাওয়ার দীর্ঘদিনের সাধারণ অবস্থা, গড় আবহাওয়া নয়। একইভাবে বাংলাপিডিয়ায় জলবায়ু সম্পর্কে বলা হয়েছে, ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের দীর্ঘ সময়ের দৈনন্দিন আবহাওয়ার সাধারণ অবস্থা (বাংলাপিডিয়া, ২০০৪, পৃ. ৪৮২)। জলবায়ুর উপাদানগুলো হলো তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু, মেঘ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, বায়ুচাপ প্রভৃতি। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক অবস্থা ওই দেশের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

> এই দায়ের জায়গা থেকেই আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে জলবায়ু পরিবর্তন। চিন্তা কাঠামোতে যুক্ত হয়েছে একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে। তাই মানুষের পাশাপাশি সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়। তেমনই সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংবাদপত্রের দায় কিছুটা বেশি

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান হিসাবে রফিক আহমেদ চারটি উপাদানের কথা বলেন, যথা: বায়ুর চাপ, বায়ুর তাপ, বায়ুর আর্দ্রতা ও অধঃক্ষেপণ, ঝড়ঝঞ্ঝা (আহমেদ, ১৯৮২, পৃ. ৮)। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণে বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠে যে চাপ প্রয়োগ করে, তাই বায়ুর চাপ। সমুদ্র সমতলে বায়ুর চাপের পরিমাণ থাকে প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ১৪.৭ পাউন্ড। ৪৫? অক্ষাংশের সমুদ্র সমতলে ব্যারোমিটারে এর মাপ হলো ২৯.৯২ ইঞ্চি। সমুদ্রে বায়ুমণ্ডলের ওজন প্রায় ৫ হাজার ৬০০ ট্রিলিয়ন টন। এই বায়ুর চাপ পরিবর্তিত হয়ে থাকে বেশ কয়েকটি কারণে, এর মধ্যে অন্যতম তাপ। উষ্ণতার তারতম্যের কারণে বায়ুর চাপ পরিবর্তিত হয়। জলবায়ুর এ উপাদানগুলো পরিবর্তনের কিছু নিয়ামক বা নিয়ন্ত্রক আছে।

সূর্যের কৌণিক অবস্থান জলবায়ুর অন্যতম নিয়ামক। তির্যকভাবে সূর্য আলো দিলে বেশি বায়ুমণ্ডল ভেদ করতে হয়; কিন্তু লম্বভাবে সূর্য কিরণ দিলে তা অনেক বেশি প্রখর হয়, যা বায়ুর তাপের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে থাকে। তাছাড়া ভূপৃষ্ঠের ৭০.৮ শতাংশ জল এবং ২৯.২ শতাংশ স্থল। সূর্যের তাপ জলের ৬০০ ফুট পর্যন্ত পৌঁছে; কিন্তু স্থলভাগে ৬০ ফুট পর্যন্ত। ফলে জল অনেক বেশি উত্তপ্ত হয় এবং এই উত্তপ্ত জল এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গেলে সেই অঞ্চলে উষ্ণতা আনয়ন করে। বায়ুপ্রবাহও জলবায়ুর অন্যতম নিয়ামক, উষ্ণ স্থানের বায়ু শীত অঞ্চলে গেলে সেই অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার শীত অঞ্চলের বায়ু উষ্ণ অঞ্চলে গেলে সেই অঞ্চলের বায়ু শীতল হয়ে ওঠে। এভাবে এ বিষয়গুলো দ্বারা জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

১.৩ জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর উদ্ভব

পৃথিবীর জলবায়ু যে পরিবর্তিত হচ্ছে, এ বিষয়ে আগে কোনো ধারণাই ছিল না। বিষয়টি ধরা পড়ে তখনই, যখন জানা গেল পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি প্রথম ধরা পড়ে ১৮ এবং ১৯ শতকে। ১৭৫৪ সালে জোসেফ ব্ল্যাক প্রথম কার্বন ডাইঅক্সাইড আবিষ্কার করেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৮২৭ সালে জিন ব্যাপ্টিস বলেন, পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড দায়ী এবং তিনি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে গ্রিনহাউজের সমার্থক হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৮৯৬ সালে স্যাভান্তে অগাস্ত বলেন, কয়লা পোড়ানোর ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে পৃথিবীতে গ্রিনহাউজ গ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পৃথিবী গরম হচ্ছে (Effects of Climate Change)।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আমরা প্রথম সতর্কতা সংকেত পাই গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে যখন হাওয়াইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিমাপ করা হয় এবং এর পরবর্তী দশকে সেখানে আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিমাপ করা হয়। সেই পরিমাপে দেখা যায়, ক্রমান্বয়ে পৃথিবীতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক ধারণাটি আমাদের মাঝে তৈরি হয়। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক জলবায়ু বিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালে। এরপর ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ আইপিসিসি (ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ) গঠন করে। আইপিসিসি গঠিত হওয়ার পরপরই বিশ্বকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয় (Causes of Climate Change)।

১৯৯০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় 'ইউএন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে জাতিসংঘ আরেকটি সম্মেলন করে। এই সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এর সদস্য হতে থাকে, যাদের 'পার্টিস' হিসাবে অভিহিত করা হতে থাকে। আর এসব 'পার্টিস' নিয়ে যে সম্মেলন হতো তাকে বলা হয় কনফারেন্স অব পার্টিস, সংক্ষেপে যাকে বলে কপ[১]। এই কপ১ প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে বার্লিনে। এভাবে ধীরে ধীরে একের পর এক কপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে (A Brief History of The Climate Change Process)।

বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর উদ্ভব হয় এভাবে। যে উদ্ভবের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। প্রথমদিকে এটা বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত থাকলেও পরবর্তী সময়ে এটি সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার অন্যতম বিষয়বস্তু হিসাবে বিবেচিত হয়।

১.৪ গণমাধ্যম ও জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু বিজ্ঞানের বিষয়টি প্রথম গণমাধ্যমে আসে ত্রিশের দশকে। ১৯৩২ সালে *নিউইয়র্ক টাইমসের* একটি সংবাদের মাধ্যমেই গণমাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদের প্রকাশ। সংবাদটিতে লেখা ছিল: 'The earth must be inevitable changing its aspect and its climate. How the change is slowly taking place and what the result will be has been considered' (New York Times, 1932, 4)। *নিউইয়র্ক টাইমসে* সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েক দশক পর থেকে, গণমাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলত মানুষ দায়ী। ১৯৫০ সালে *স্যাটারডে ইভিনিং*-এ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়, যেখানে বলা হয়েছে–মানুষই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী (Abarbanel and McClausky, 1950)।

এ বিষয়ে আরেকটি ধারণা পাওয়া যায় ওয়ালদেমার কেইম্পপার্টের *নিউইয়র্ক টাইমসের* একটি লেখায়। সেখানে তিনি লিখেছেন এভাবে, 'Today more carbon dioxide is being generated by man's (sic) technological processes than by volcanos, geysers and hot spring' (New York Times, 1956)। প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর ১৯৫৭ সালকে 'আন্তর্জাতিক জিওলজিক্যাল বর্ষ' ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৫ সালে আমেরিকার ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে, যার শিরোনাম ছিল 'জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ' (Fleming, 1998)।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পায় রাসেল কারসন্সের *সাইলেন্ট স্প্রিং* নামক বইটি প্রকাশিত হলে। তিনি এ বইয়ের মাধ্যমে জানান দেন কীটনাশক ব্যবহারের কারণে বিশ্বে পরিবেশগত ঝুঁকি বাড়ছে। তিনি বইটির মাধ্যমে এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করেন এবং পরিবেশ নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রে শিল্পকারখানার বাধা দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন (Carson, 1962)। বইটি লেখার পর থেকে সমাজের সামনে এ প্রশ্নগুলো আসতে থাকে এবং সমাজ, গণমাধ্যম ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় (Boykoff and Smith, 2010)। এ পরিপ্রেক্ষিতে বার্জেস ও গোল্ড গণমাধ্যম ও সংস্কৃতিকে পরিবেশগত ইস্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখিয়েছেন (Burgess and Gold, 1985)।

নব্বইয়ের দশকের মধ্যদিকে মানবসৃষ্ট কারণেই যে জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে, এ বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি আরও শক্ত হতে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর উদ্ভবের দিকে তাকালেও দেখা যায়, ইস্যুটি নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝিতে আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রে আসে। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমেও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি জায়গা দখল করতে শুরু করে। ২০০৫ সালে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা আঘাত হানলে জলবায়ু পরিবর্তনের আলোচনা তুঙ্গে ওঠে। বিশেষ করে *টাইম ম্যাগাজিন*, *দ্যা স্টার্ন রিভিউ*, *বিজনেস উইক*, *অবজারভার* ইত্যাদি পত্রিকায় জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। এভাবে গণমাধ্যমের দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বে সামাজিক সমস্যা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউনাইটেড নেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন কিয়োটা প্রটোকল জলবায়ু পরিবর্তনকে আন্তর্জাতিক নীতিমালা এবং রাজনৈতিক সমঝোতার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। (Lorenzoni and Pidgeon, 2006)

১.৫ সংবাদপত্র ও জলবায়ু পরিবর্তন

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জোয়ারে অনেকেই হয়তো প্রিন্ট মিডিয়া বা সংবাদপত্রের কথা ভুলে যেতে পারেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়া সংবাদপত্র শিল্পের চেয়ে অনেকাংশে অগ্রগামী; দ্রুতগতিসম্পন্ন, তাৎক্ষণিক এবং জমকালো ও আকর্ষণীয়। এরপরও হেনরি ওয়ার্ড থেচার বলেছেন, 'জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের প্রতিফলন ঘটে একমাত্র সংবাদপত্রেই' (সিদ্দিকী, ২০০৭)। থেচারের উক্তি প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেফারসনের উক্তিটি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, 'আমাকে সংবাদপত্র ছাড়া সরকার এবং সরকার ছাড়া সংবাদপত্র যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বললে দ্বিতীয়টি বেছে নিতে আমার দ্বিধা থাকা উচিত নয়' (আহমেদ, ২০০৮)। অর্থাৎ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপক প্রভাব থাকলেও সংবাদপত্র একটু ভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে এ পার্থক্য আরও স্পষ্ট। কেননা প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে কয়েকটি বিষয়ে অনন্য। বিষয়গুলো হলো (Johnston, 2008, p. 159):

* প্রিন্ট মিডিয়া একটি স্থায়ী দলিল। কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় স্থায়ীভাবে কিছু সংরক্ষণ করা যায় না।
* প্রিন্ট মিডিয়া যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়। এর জন্য আলাদাভাবে কোনো বৈদ্যুতিক সংযোগের প্রয়োজন নেই।
* এখানে সংবাদের গুরুত্ব অনুযায়ী জায়গা ছাড়া যায়। তাছাড়া অনেক জটিল বিষয়কে বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুব সহজেই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যায়। এই সুযোগ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নেই বললেই চলে।
* ইলেকট্রনিক মিডিয়ার (রেডিয়ো ব্যতীত) মতো এখানে ঘটনাকে দৃশ্যমান করা যায়। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ভিডিয়ো ও ছবি দুটিই ব্যবহার করা যায়, সংবাদপত্রে শুধু ছবির ব্যবহার করা যায়।
* ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিশেষত টেলিভিশন মূলত ছবি বা ভিডিয়োনির্ভর সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। যে বাধ্যবাধকতা সংবাদপত্রের নেই। সংবাদপত্র ছবিসহ বা ছবি ছাড়া দুই ধরনের সংবাদই পরিবেশন করতে পারে।
* অবসরের যে কোনো সময় সংবাদপত্র পড়া যায়। কিন্তু পাঠক বা দর্শক ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদ শুনতে চাইলে তাকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সময়সূচির ওপরই নির্ভর করতে হবে।
* সংবাদপত্র ইলেকট্রনিক মিডিয়ার চেয়ে অনেক সস্তা। অনেক সময় পত্রিকাগুলো তাদের মূল কাগজের সঙ্গে ম্যাগাজিন বিনামূল্যে দিয়ে থাকে।

এভাবে সংবাদপত্র ইলেকট্রনিক মিডিয়ার চেয়ে নিজেকে অন্যভাবে মেলে ধরে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সংবাদপত্রের মতো সংবাদ সম্পাদনা করার সুযোগ নেই, তাই সম্পাদনাবিহীন সংবাদ আকাঁড়া থেকে যাচ্ছে। সেদিক দিয়ে সংবাদপত্রের সংবাদ অনেকটাই পরিপক্ব। বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, রোগব্যাধি-চিকিৎসা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ সব ক্ষেত্রেই সংবাদপত্রের অবাধ পদসঞ্চার। (সিদ্দিকী, ২০০৭)

সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকের অবাধ পদসঞ্চারের জায়গা থেকে সাংবাদিকতার কিছু দায় থেকে যায় সমাজের প্রতি। সাংবাদিকতার দায়কে কখনো সাংবাদিকের গুণাবলি, কখনো সাংবাদিকের আচরণবিধি প্রভৃতির মাধ্যমে পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করছে। তেমনই বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য কিছু আচরণবিধি রয়েছে। বাংলাদেশ সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি, ১৯৯৩ (২০০২ সালে সংশোধিত) প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৪-এর ১১(বি) ধারা অনুযায়ী, সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধিতে বলা হয়েছে–জনগণকে আকর্ষণ করে অথবা তাদের ওপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়ে জনগণকে অবহিত রাখা একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব (বিশ্বাস, ২০০৮)। অর্থাৎ জনগণ প্রভাবিত হয়–এমন বিষয় সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা সাংবাদিকতার দায়। জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা আজ জনগণ প্রভাবিত হচ্ছে, এই প্রভাবের জায়গা থেকে জলবায়ু পরিবর্তন সাংবাদিকতার বিষয়বস্তু হয়েছে। 'পরিবেশবিষয়ক রিপোর্টিং' নামে সাংবাদিকতার একটি বিট থাকলেও বর্তমানে 'জলবায়ু পরিবর্তনকে' একটি আলাদা বিট হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে (Boykoff and Smith, 2010)। যে কারণে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার দায় বেড়েছে বৈ কমেনি।

এরকম দায়ের জায়গা থেকে *নিউইয়র্ক টাইমসের* প্রতিবেদক এডি রেংকিন উল্লেখ করেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলো এখনো গণমাধ্যমের জন্য গরম বা তরতাজা খবর নয়, যা আজই প্রচার করতে

সংবাদপত্রের পাশাপাশি বড়ো বড়ো করপোরেট প্রতিষ্ঠান দ্বারাও প্রভাবিত হয় জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ। এ সম্পর্কে মালয়েশিয়ার *ন্যাচার সোসাইটি* পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক শান্তারা মোহন বলেন, 'বড়ো বড়ো করপোরেট ব্যবসায়ী জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সাংবাদিকতার পৃষ্ঠপোষণ করতে চায় না। কারণ, এদের অনেকেই পরিবেশের ক্ষতির কাজে লিপ্ত রয়েছে'

হবে। বরং এটা শতাব্দীর চলমান প্রক্রিয়া, যা সাংবাদিকদের জন্য বেশ জটিল' (খান, ২০০৮)। তাই জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক রিপোর্টিং এখন প্রায় দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিট কাভার করতে সাংবাদিককে এ বিষয়ক কিছু টেকনিক্যাল বিষয় সম্পর্কে জেনে নিতে হয় (মজুমদার, ২০০৮)। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সাংবাদিক বা সংবাদপত্র ব্যাখ্যাদাতা, অনুবাদক এবং তথ্য সরবরাহকারী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে সাংবাদিকতায় যখন রিপোর্টার ও সম্পাদকরা প্রিন্ট-পূর্ব অবস্থায় সমঝোতা করে, তখন পেশাদারি সাংবাদিকতার নীতি ও আদর্শ সম্মুখবর্তী হওয়ার পরিবর্তে ঝামেলা তৈরি করে (Boykoff, 2007)।

ইস্যু হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সব চাহিদাময় ফিচারকে মিডিয়ায় জায়গা পাওয়ার জন্য সংবাদভাষ্যে অনূদিত হতে হয় (Boykoff and Boykoff, 2004)। সংবাদপত্রের পাশাপাশি বড়ো বড়ো করপোরেট প্রতিষ্ঠান দ্বারাও প্রভাবিত হয় জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ। এ সম্পর্কে মালয়েশিয়ার *ন্যাচার সোসাইটি* পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক শান্তারা মোহন বলেন, 'বড়ো বড়ো করপোরেট ব্যবসায়ী জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সাংবাদিকতার পৃষ্ঠপোষণ করতে চায় না। কারণ, এদের অনেকেই পরিবেশের ক্ষতির কাজে লিপ্ত রয়েছে' (খান, ২০০৮)।

সব বাধা পেরিয়ে এরপরও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদকে আকর্ষণীয় করা যেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত রিপোর্ট আকর্ষণীয় করার কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন বিজ্ঞানী লেখক পারপেল রোমেরো। তার মতে, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, আকর্ষণীয় স্থান এবং প্রিয় ফুল, পাখি বা প্রাণীকে জড়িয়ে রিপোর্ট করলে তাতে পাঠক-দর্শকের আকর্ষণ করে (খান, ২০০৮)। সংবাদপত্রে ছবি পাঠককে যেমন আকর্ষণ করে, তেমনই সংবাদের সঙ্গে পাঠককে একাত্ম হতে সাহায্য করে (Moen, 1989, P. 51)। জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রেও যদি ছবির ব্যবহার করা হয় তবে সংবাদটি আরও ফলপ্রসূ হবে। এভাবে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এগিয়ে আসতে পারে।

১.৬ জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদের ইস্যুগুলো

প্রকৃতির ওপর মানুষের নির্যাতনের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাকৃতিক কারণে জলবায়ু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হলেও মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ু খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানবসৃষ্ট কারণকেই মূল কারণ হিসাবে দেখা হয়। মানুষ যে জলবায়ু পরিবর্তন করছে, এ বিষয়ে বেশ শক্ত প্রমাণ আছে। আর এ প্রক্রিয়াটি মানুষ সম্পাদন করছে গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপাদনের মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মিথেনের মতো গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপাদন করে। শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী ১৫০ বছরের বেশি সময় ধরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ক্রমাগত অধিক হারে শিল্পকারখানা থেকে নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইডসহ বিভিন্ন গ্যাস নির্গমনের ফলে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বেড়ে চলেছে, যার জন্য দায়ী মানুষই। মানবসৃষ্ট কারণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি, জমি ব্যবহারে পরিবর্তন, বৃক্ষনিধন, বন উজাড়, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, মিথেন গ্যাস নির্গমন, কৃষি প্রভৃতি কারণে জলবায়ু পরিবর্তিত হয় (Climate change challenge)। এছাড়াও নদীর নাব্যতা হ্রাস, পানিদূষণ, শব্দদূষণ, তেলদূষণও জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী যেসব ইস্যুতে সংবাদ করা যেতে পারে, সেগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

১.৬.১ কার্বন ডাইঅক্সাইড

পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ওজোন স্তর ধীরে ধীরে ক্ষয়ে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে প্রবেশে সাহায্য করে থাকে। অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবীর পরিবেশকে নষ্ট তথা জীবের বসবাসের অনুকূল পরিবেশ নষ্ট করে থাকে। এ পরিস্থিতি জলবায়ু পরিবর্তন করে থাকে। কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড মূলত বৃদ্ধি পায় অতিরিক্ত শিল্পকারখানা বৃদ্ধি, গাড়ি, ভাঁটা, নগরায়ণের বিভিন্ন উপকরণ (যেমন: কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনকারী বিভিন্ন যন্ত্রাংশ) প্রভৃতি কারণে। ইউকে সরকার তার দেশের কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বলে, তার দেশে মোট কার্বনের ৪০ শতাংশ উৎপন্ন হয় মানবসৃষ্ট কারণে বিশেষ করে বাড়িতে, গাড়ি চালাতে কিংবা বিমান যোগাযোগ থেকে এ কার্বন উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে শিল্পকারখানা থেকে ৪%, কৃষি থেকে ৭%, যানবাহন থেকে ২১%, বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে ৬৫% কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয় ('A Brief History of Climate Change')। এছাড়া রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ পোড়ানোর কারণে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। এই রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থগুলো উৎপন্ন হয় বিভিন্ন শিল্পকারখানা থেকে। যেখানে থাকে মানুষের চরম অর্থলালসা। পরিবেশের দিকে না

তাকিয়ে তারা ক্রমান্বয়ে অর্থের লোভে নষ্ট করতে থাকে পরিবেশ। যার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল আমাদের এই জলবায়ু পরিবর্তন। এসব বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করা যেতে পারে।

১.৬.২ জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো

জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে বোঝানো হচ্ছে এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন: কয়লা, তেল, গ্যাস প্রভৃতি। এই জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর কারণে উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণ গ্রিনহাউজ গ্যাস। যুক্তরাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটে বলা হয়, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর কারণে ২৭ বিলিয়ন টন গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপন্ন হয় ('A Brief History of Climate Change' B)। এই গ্যাস উৎপাদন হওয়ার পেছনে মূলত কাজ করে রান্নার কাজ, যাতায়াত প্রভৃতি নানা গৃহস্থালি কাজ। এছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন এবং কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়াও গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপন্ন করে। এরকম ইস্যুতে বিশেষ প্রতিবেদন করা যেতে পারে।

১.৬.৩ বৃক্ষনিধন ও বন উজাড়

রোপণের চেয়ে বেশি পরিমাণ গাছ কেটে ফেলাই বৃক্ষনিধন, যা জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু গাছ কেটে ফেলার কারণে বাতাসে ৫.৯ বিলিয়ন টন কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি নির্গত হয়। এর কারণ হচ্ছে–গাছ প্রকৃতি থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে; কিন্তু গাছ যখন কেটে ফেলা হয়, তখন অনেক কার্বন ডাইঅক্সাইডই আর গাছ শোষণ করতে পারে না। ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের আধুনিক সমাজ। মানুষ আধুনিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অপরিকল্পিতভাবে বন উজাড় করছে। গড়ে তুলছে বিভিন্ন বিপণিবিতান, শপিং কমপ্লেক্স। তাছাড়া আধুনিক আসবাবপত্র, বাসস্থানের সরঞ্জাম তৈরির লক্ষ্যে বৃক্ষনিধন এবং বন উজাড় হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ ও অক্সিজেন ত্যাগের যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তা বাধাগ্রস্ত হয় এবং এর প্রভাব এসে পড়ে জলবায়ুর ওপর। এই প্রভাবের ওপর তৈরি হতে পারে সংবাদ।

১.৬.৪ কৃষি

কৃষি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কৃষিজমিতে অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগ এবং সারের ব্যবহার মাটিকে যেমন অনুর্বর করে, তেমনই জলাশয়সহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া কৃষিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ খাদ্যের মধ্যে বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকলাপ তৈরি করে, যা বেশির ভাগ সময়ই মানবসমাজের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ কৃষি বাস্তুসংস্থান প্রক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি করে, যা জলবায়ু পরিবর্তনে সাহায্য করে। ফলে অতিরিক্ত কীটনাশক ও সার ব্যবহারের ফলাফল নিয়ে সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করা যেতে পারে।

১.৬.৫ বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চল

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ১৯ জেলা: বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোর, ঝালকাঠি, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নড়াইল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা ও শরীয়তপুর। এসব জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে পরিবর্তন দেখা যায়, সেগুলো নিয়ে সংবাদ হতে পারে। ইস্যুগুলো হলো:

জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার প্রভাব, মিঠাপানির স্রোত, খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন, চিংড়ি ঘেরের বিস্তার, অপরিকল্পিত বাঁধ, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নিম্নচাপসহ দুর্যোগপ্রবণতা, প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর জীবিকার বদলে যাওয়া, দরিদ্র পরিবারে খাদ্যহীনতা, নদীভাঙনের প্রবণতা, ধানের উৎপাদন কমে যাওয়া, ধানের বহু জাত হারিয়ে যাওয়া, কৃষি শ্রমিকদের পেশা বদল, সুন্দরবনের গাছে আগা মরা রোগ, সংরক্ষিত বন ধ্বংস হওয়া, বিদেশি গাছ লাগানোর প্রবণতা যেমন: এপিল এপিল, রেইন ট্রি প্রভৃতি, মাছের অনেক প্রজাতির হারিয়ে যাওয়া, বহু জেলের পেশা বদল, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, বর্ষায় বৃষ্টি কমেছে, শীতকালে শীত কমেছে, গ্রীষ্মেও তাপ বেড়েছে প্রভৃতি বিষয়ে সংবাদ হতে পারে। (মন্টু, ২০০৮)

১.৬.৬ বাংলাদেশের হাওড় অঞ্চল

দেশে হাওড়াঞ্চলের সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তবে সাত জেলা হাওড় জেলা হিসাবে পরিচিত। বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের একটি দলিলে হাওড়ের মোট সংখ্যা ৪১৪ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরেকটি সূত্র হাওড়ের সংখ্যা ৪২৩টি বলে উল্লেখ করেছে। এর মধ্যে সুনামগঞ্জে ১৩৩, কিশোরগঞ্জে ১২২, নেত্রোকোনায় ৮০, সিলেটে ৪৩, হবিগঞ্জে ৩৮, মৌলভিবাজারে ৪ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ৩টি হাওড় রয়েছে। এই অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে যেসব সংবাদ হতে পারে সেগুলো হলো:

আমনের আবাদ কমে যাওয়া, বিভিন্ন জাতের ধান হারিয়ে যাওয়া, নদী ভরাট হয়ে গভীরতা কমে যাওয়া, বহু মানুষের অর্থসম্পদ হারিয়ে আরও গরিব হয়ে যাওয়া, নদীভাঙনের শিকার হওয়া, গাছপালার বহু প্রজাতি হারিয়ে যাওয়া, হাওড়ের বিলে শাপলা-শালুক না ফোটার কারণ, কর্মসংস্থানের অভাব বেড়ে যাওয়া, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ তিন ঋতুতে বন্যা, অকাল বন্যায় বীজতলা সংকট, বৈরী আবহাওয়ায় পরাগায়ণ সমস্যায় ধানের চিটা হওয়া প্রভৃতি। (মন্টু, ২০০৮)

১.৬.৭ বাংলাদেশের চরাঞ্চল

সারা দেশে বর্তমানে নদী থেকে জেগে ওঠা চরের পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ৭২২ দশমিক ৮৯ বর্গকিলোমিটারের বেশি। এ চর দেশের মোট ভূমির ১ দশমিক ১৬ শতাংশ। গোটা চরাঞ্চলকে আকার, ভৌগোলিক অবস্থান এবং স্থায়িত্ব অনুসারে চরকে দ্বীপচর ও মূলভূমির চর হিসাবে ভাগ করা হয়েছে। স্থায়িত্ব অনুসারে চরকে ভাগ করা হয় স্থায়ী চর ও ভাঙন চর। মোটামুটি বলা যায়, কুড়িগ্রাম, রংপুর, লালমনিরহাট, জামালপুর, গাইবান্ধা প্রভৃতি চরাঞ্চলভুক্ত জেলা। এখানে যে প্রভাব দেখা যায়, সেটার ভিত্তিতে সংবাদ হতে পারে। সংবাদের ইস্যুগুলো হলো:

বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন প্রজাতির ধান, মাছের বহু প্রজাতি হারিয়ে যাওয়া, কাজের সন্ধানে অন্য জেলায় যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি, বর্ষায় প্রচুর বৃষ্টিপাত, খরায় খরতাপ এবং শীতে শৈত্যপ্রবাহ, দক্ষ কৃষি পেশাজীবীদের অভাব, জৈবসারের উৎস কমে যাওয়া, বিদেশি গাছপালা লাগানোর প্রবণতা বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, শুকনা মৌসুমে নদী শুকিয়ে যাওয়া, নৌ যোগাযোগ বন্ধ হওয়া, জেলে পরিবারের সংকট, কর্মসংস্থানের অভাব, নারী ও শিশু অধিকার লঙ্ঘন, পানিব্যবস্থা ও সেচসংকট, শুকনা মৌসুমে সেচের পানির সংকট, অকাল বন্যায় ডুবে

জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে সবচেয়ে বড়ো পদক্ষেপ হলো মানুষকে সচেতন করা। জলবায়ু পরিবর্তিত হয় এমন কাজ না করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে সচেতন করা। তবেই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি প্রশমনের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমানো সম্ভব হবে

যায় বিস্তীর্ণ জনপদ, বন্যা-খরা-নদীভাঙন প্রধান দুর্যোগে পরিণত হওয়া, শীতকালে দিনে গরম রাতে প্রচণ্ড শীত প্রভৃতি। (মন্টু, ২০০৮)

১.৬.৮ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। কারণ, এর ফলে অনিবার্য ক্ষতির পরিমাণ এখনো অনিশ্চিত এবং খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্ভর করবে কত দ্রুত মিটিগেশন করা যায়, অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ঘটায় যেসব গ্যাস, সেগুলোর নির্গমন কমিয়ে আনা যায় তার ওপর। আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় কেবল খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে কথা বলতেই বেশি আগ্রহী। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দারিদ্র্য ও দুর্যোগে আক্রান্ত দেশগুলোর জন্য খাপ খাওযানো বা অভিযোজন তহবিল জরুরি হলেও এটি অর্থহীন হবে যদি পাশাপাশি উন্নত দেশগুলো বাধ্যতামূলকভাবে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা না কমায়।

কিন্তু উন্নত দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ কমানোর কথা না বলে বারবার অভিনব সব পদ্ধতির কথা বলে। কখনো 'কার্বন ক্রেডিট' আবার কখনো 'কার্বন বাণিজ্য' বা 'কার্বন কর'-এর কথা বলে; কিন্তু তারা বারবার কার্বন নির্গমন কমানোর বিষয়ে নিশ্চুপ থেকেছে। খাপ খাওয়ানো বা অ্যাডাপটেশনের বিষয়ে তারা বারবার তহবিল সাহায্যের কথা বলেছে। তহবিল সাহায্যের এই অর্থ নিয়েও রয়েছে নানা বিতর্ক[২]। অভিযোজনের এই তহবিল বিতর্ক নিয়ে উপকূল হাওড় বা চরাঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের ভাবার সময় কম। বরং তাদের উদ্ভাবিত দেশীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। এই পদ্ধতিগুলো জনগণের কাছে আরও বিস্তর পরিসরে প্রচার করা গেলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি অনেকাংশেই লাঘব করা যাবে। তাদের উদ্ভাবিত কিছু পদ্ধতি এখানে আলোচনা করা হলো (রশীদ, ২০০৮)।

* নোয়াখালীর স্থানীয় মানুষ কিছু কিছু পোকা বিশেষ করে ঝিঁঝি পোকাদের এলোমেলো উড়তে দেখলে তারা বুঝতে পারেন যে বড়ো ধরনের কোনো ঝড়-জলোচ্ছ্বাস আসছে। তখন তারা প্রস্তুতি নেন। তাদের কাছে এই পোকাগুলোর সংকেত রেডিয়ো-টিভির চেয়েও নাকি বেশি নির্ভরযোগ্য।
* লবণাক্ততা উপকূলীয় অঞ্চলে একটি বড়ো সমস্যা। ফলে এখানের কৃষক লবণের হাত থেকে বাঁচতে 'মালাচিং' পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এ পদ্ধতিতে ধানের চারা একটু বড়ো হলেই তারা জমিতে খড় ছিটিয়ে দেন, এতে জমিতে লবণপানি ঢুকে পড়লেও তা ধানের ক্ষতি করতে পারে না।
* উপকূলের অনেক এলাকায় মানুষ নির্দিষ্ট উঁচুতে মাচা তৈরি করে ঘর তৈরি করেছেন। যাতে বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের সময় ঘরবাড়ি ভেসে না যায়।
* নোয়াখালীর মানুষ জলোচ্ছ্বাসের সময় নিজেদের বাঁচাতে তাদের উঠানে সারা বছরই একটি মোটা ও বড়ো বাঁশ পুঁতে রাখেন, আর এই বাঁশের সঙ্গে বাঁধা থাকে শক্ত দড়ি। এতে জলোচ্ছ্বাসের সময় তারা এই বাঁশ ও রশি ধরে টিকে থাকতে পারেন।
* নোয়াখালীর পরিবেশকর্মী এনাম আহসান জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে টিকে থাকার জন্য দ্বিস্তরবিশিষ্ট পুকুর তৈরির প্রস্তাব করেন।
* উপকূলীয় এলাকার মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে ফসল চাষে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে।
* বন্যায় ধান আবাদের সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে চলনবিলের মানুষ ধানের বদলে সরিষা উৎপাদন করছেন।
* মানুষ পানির ওপরে ভাসমান পদ্ধতিতে বীজতলা এবং কান্দিবেড় পদ্ধতিতে চাষাবাদ করছেন।
* কুড়িগ্রামের মানুষ খরা ও বন্যায় নাকাল হওয়ায় বিকল্প ফসল হিসাবে ভুট্টা, আলু ও কলা চাষ করছেন।
* রংপুরে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগের মাত্রা বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলের কৃষকরাও বের করেছেন ধানচাষের নয়াপ্রযুক্তি 'কুশি ধান' প্রযুক্তি (রহমান, ২০০৮)।

বাংলাদেশের মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে এভাবে নিজেরাই দেশীয় পদ্ধতিতে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। এ পদ্ধতিগুলো দেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অনেকাংশেই প্রশমিত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১.৬.৯ জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সচেতনতা সৃষ্টিবিষয়ক সংবাদ

জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে সবচেয়ে বড়ো পদক্ষেপ হলো মানুষকে সচেতন করা। জলবায়ু পরিবর্তিত হয় এমন কাজ না করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে সচেতন করা। তবেই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি প্রশমনের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

কমানো সম্ভব হবে। কার্বন কমানোর বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা আরও কিছু বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ দেন। সেই সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে (রশীদ, ২০০৮):

* মৎস্যচাষের জন্য সব জলাভূমি যথাযথ ব্যবহার করা।
* বেশি পরিমাণে দেশি গাছের সংরক্ষিত বনাঞ্চল গড়ে তোলা।
* নদী ভরাট বন্ধ করা। নদীর গতিপথ পরিবর্তন না করা। নদীদূষণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
* সব ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন, পরিবহণ ও ব্যবহারে অপচয় রোধ করা।
* কলকারখানায় জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
* গণপরিবহণব্যবস্থা সহজ করা।
* প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ করা।
* উন্নত চুলা ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয় করা।
* সৌর, বায়ু এবং অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো।
* গৃহস্থালির, পৌর ও শিল্পকারখানার আবর্জনা প্রক্রিয়াজাত করা।
* জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহড়া প্রদর্শন করা।
* নিচু এলাকায় ঘরবাড়ি উঁচু করার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে হবে (নিয়োগী, ২০০৮)।
* 'ধান ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা। খাদ্যসংকটকালে যেন সবাই এই ধান ব্যাংকের মাধ্যমে খাদ্যাভাব পূরণ করতে পারে (নিয়োগী, ২০০৮)।

উপরিউক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করলে অনেকাংশেই জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন করা যেতে পারে। সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে গণমাধ্যম বেশি ভূমিকা পালন করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন করা যায় এরকম বিষয়গুলো গণমাধ্যমে বারবার প্রচার করা কিংবা জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের উপায় সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে প্রচারণা চালাচ্ছে, এ সংক্রান্ত সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে গণমাধ্যম সচেতনতামূলক প্রচার চালাতে পারে। সমাজে এভাবে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা গেলে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি অনেকটাই রোধ করা যাবে।

১.৬.১০ জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার ও গবেষণা

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার ও গবেষণা বিষয়ে নানা তথ্য-উপাত্ত প্রচার করা হয়ে থাকে। এসব তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। দেশে-বিদেশে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে নতুন কী ধারণা তৈরি হচ্ছে, ধনী দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কী ধরনের সিদ্ধান্ত প্রদান করছে, সেই বিষয়গুলো নিয়ে সংবাদ পরিবেশিত হতে পারে।

১.৭ জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে করণীয়

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ অন্য সংবাদের মতো, তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে পারলে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ অধিক কার্যকরী হয়ে উঠবে।

ক. জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ নাটকীয়ভাবে লেখা যাবে না। এবিষয়ক সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে সংবাদটি পরিবেশিত হচ্ছে পাঠককে অবহিত করার জন্য, ওয়াচডগ হিসাবে ভূমিকা পালন করার জন্য এবং সোশ্যাল ইস্যু নিয়ে ক্যাম্পেইন করার জন্য।

গ. জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে চিন্তা করতে হবে এবং স্থানীয়ভাবে লিখতে হবে।

ঘ. পাঠকের বিশ্বাস তৈরি করতে হবে। সেই সঙ্গে সংবাদের সঙ্গে পাঠকের ব্যস্ততা তৈরি করতে হবে। পাঠকের বিশ্বাস ও ব্যস্ততা বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্যের সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম হবে।

ঙ. বিজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়ে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। বিজ্ঞান সম্পর্কে স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। বিজ্ঞান ও নীতির সংমিশ্রণ করা যাবে না।

ছ. জলবায়ু পরিবর্তনের কোন 'বিতর্ক' নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করছেন, সেটা নির্দিষ্ট করে লিখতে হবে।

জ. বৈজ্ঞানিক টার্ম ব্যবহৃত হলে সেটি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হবে।

ঝ. সহজ, সরল ও বোধগম্যভাবে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপস্থাপন করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ ফলাফল অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এ ভয়াবহ বিষয়টি মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন সবার একতা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। গণমাধ্যমের ছোঁয়ায় এই প্রচেষ্টা আরও বেগবান হতে পারে। সংবাদপত্র বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ পরিবেশন করবে, এটিই কাম্য। এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠায় এবিষয়ক সংবাদকে স্থান দিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না করে গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক মানুষের বিষয়কে সংবাদে তুলে আনতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে আরও বেশি সচেতনতামূলক সংবাদ প্রকাশ করতে হবে। খাপ খাওয়ানো বিষয়ে দেশীয় পদ্ধতির প্রচারণা বাড়াতে হবে। সর্বোপরি গণমাধ্যমকে সত্যিকারের গণমানুষের গণমাধ্যম হয়ে উঠতে হবে।

তথ্যসূত্র

* আহমেদ, মুসতাক (২০০৮)। 'গণতন্ত্রের জন্য তথ্য ও গণমাধ্যম'। *বাংলাদেশ জার্নালিজম রিভিউ (বিজেআর)*। ভলিউম: ৪, ইস্যু: ৩, জুন ২০০৮, পৃ. ১২।
* আহমেদ, রফিক (১৯৮২)। *জলবায়ু বিজ্ঞান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
* খান, আবদুর রহমান (২০০৮)। 'বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও সাংবাদিকতা'। *নিরীক্ষা*। সংখ্যা: ১৭৩-১৭৪, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩-৬।
* চৌধুরী, ফারুক (২০১১)। জলবায়ু সংকট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন। *কমরেড*। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। জানুয়ারি ২০১১।
* বিশ্বাস, আশিষ (২০০৮)। 'সাংবাদিকতার দায়'। *বাংলাদেশ জার্নালিজম রিভিউ (বিজেআর)*। ভলিউম: ৪, ইস্যু: ৪, জুলাই ২০০৮, পৃ. ৩৭।
* মন্টু, রফিকুল ইসলাম (২০০৮)। *জনজীবন ও জীববৈচিত্র্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব*। পরিবেশপত্র; বর্ষ-১১, সংখ্যা-১/২, পৃ. ২০।
* মজুমদার, মোস্তফা কামাল (২০০৮)। 'জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক রিপোর্টিং'। *নিরীক্ষা*। সংখ্যা: ১৭৩-১৭৪, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩-৬।
* মুহাম্মদ, আনু (২০১০)। *মানুষের সমাজ*। ঢাকা: সংহতি প্রকাশন।
* রশীদ, আমীন আল (২০০৮)। 'জলবায়ু পরিবর্তন তবু টিকে থাকা'। *পরিবেশপত্র*। বর্ষ-১১, সংখ্যা-৩/৪, পৃ. ২৬।
* সিদ্দিকী, মাহফুজ (২০০৭)। 'সংবাদপত্র বনাম ইলেকট্রনিক মিডিয়া'। *নিরীক্ষা*। ১৫৫তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৯-২১।
* Abarbanel, A and McClausky, T (1950). 'Is the world getting

warmer?' *Saturday Evening Post.* 1 July 22-23, 57, 60-63.
* Barry, R.G. and Chorley, R.J. (1972). *Atmosphere, Weather and Climate*. London (Methuen).
* Boykoff, Maxwell T. and Smith, Joe (2010). *Media Presentatios of Climate Change.* Retrieved From: www.sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_Files/2010.31.Pdf, on 20 January 2011.
* Boykoff, M and Boykoff, J (2004). 'Bias as balance: global warming and the U.S. prestige press'. *Global Environment Change*. 14:125-136.
* Boykoff, Maxwell T (2007). 'From convergence to certain: United States mas media representations of anthropogenic climate science'. Transections of the Institute of British Geographers 3:477-89.
* Burgess, J.A. and Gold, J.A. (eds.) (1985). *Geography, The Media and Popular Culture.* London: Croom Helm.
* Burroughs, William James (2001). *Climate Change: A Multidisciplinary Approach*. Cambridge University Press.
* Carson, R. (1962). *Silent Spring.* New York: Houghton Miffin.
* Fleming, R. (1998). *Hitorical Perspectives on Climate Change.* Oxford: Oxford University Press.
* Johnston, Jane (2008). *Media Relations.* Australia: Allen and Unwin.
* Lorenzoni, I. and Pidgeon, N.F. (2006). 'Public views on climate change: European and USA perspectives'. *Climate Change,* 77:73-95.
* Moen, Daryl R. (1989). *Newspaper Layout and Design.* USA: Lova state university press.
* Sellers, Willam D. (1972). *Physical Climatology.*
* 'A Brief History of Climate Change'. Retrieved From: www.direct.gov.uk/en/Environmentandgreeerliving/Thewidere nviron ment/Climatechange/DG_072901, on 21 April 2010.
* 'A History of The Climate Change Process'. Retrieved from: www. astrobio.net/indexphp?option=com_retrospection&task=detail&id=35 30, on 21 April 2010.
* 'Causes of Climate Change'. Retrieved From: http://www.direct.gov.uk/en/Environmentandgreenerliving/ Thewidere nvironment/Climatechange/DG_072901, on 25 February 2011.
* 'Climate Change Challenge'. Retrieved From: http://www.climatechangechallenge.org/Resource%20Centre/Resource%20Centre%20Home.htm, on 20 February 2011.
* 'Effects of Climate Change'. Retrieved From: http://www.direct.gov.uk/en/Environmentandgreenerliving/Thewidere nvironment/Climatechange/DG_072901, on 20 March 2011.
* "What's the difference between weather and climate". Retrieved From: http://eo.ucar.edu/kids/green/what1.htm, on 20 January 2011.

পাদটিকা

১. 'কপ' হলো ইংরেজি শব্দ 'COP'। শব্দটি 'Conference Of Parties'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

২. বিস্তারিত দেখুন: 'জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বড় সমস্যা হবে দুর্নীতি'। *দৈনিক প্রথম আলো*। ১ মে ২০১১। ঢাকা: বাংলাদেশ। এবং 'পরিবেশ অধিদপ্তরকে অর্থ দিতে আপত্তি জাতিসংঘের'। *দৈনিক প্রথম আলো*। ১৪ মে ২০১১। ঢাকা: বাংলাদেশ।

লেখক: প্রভাষক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

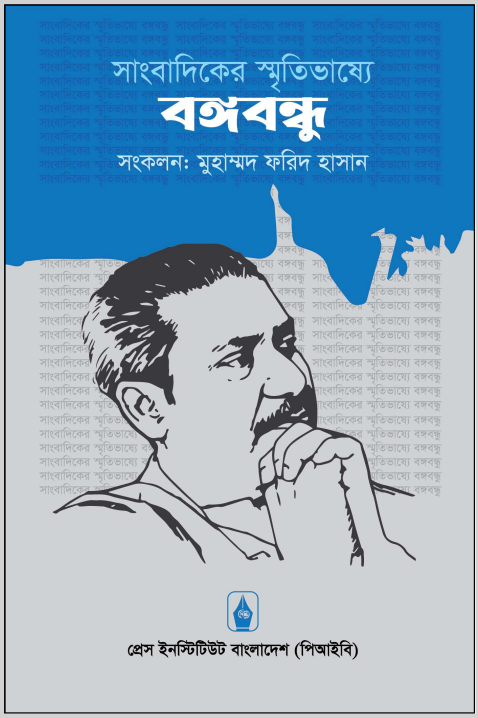

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

উপকূল সাংবাদিকতা বিষয় ❑ কলাকৌশল ❑ চ্যালেঞ্জ

রফিকুল ইসলাম মন্টু

উপকূল অঞ্চল সংবাদের বৃহৎ ক্ষেত্র। 'উপকূল' শব্দটি মনে পড়লেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে নদীনালা-সমুদ্রের বিশাল এক সমারোহ। যেখানে আছে দ্বীপ-চরের সমাহার; কঠিন লড়াই করে টিকে থাকা হাজারো মানুষের গল্প। উপকূলের দিকে নজর দিলে আমাদের মনে পড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা। বারবার ঘূর্ণিঝড়ে নিঃস্ব হওয়া মানুষ আবার জীবনের সন্ধান করে এই উপকূলে। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় এখনো উপকূলের বহু মানুষকে কাঁদায়। উপকূলে আছে সমস্যা-সংকট, মানুষের জীবন-জীবিকার লড়াইয়ের গল্প। এর পাশাপাশি উপকূল অঞ্চলজুড়ে আছে বৈচিত্র্যময় সম্ভাবনার নানা বিষয়। প্রাকৃতিক বিপদে বারবার হোঁচট খেয়ে উপকূল ঘুরে দাঁড়ায়, মাথা তোলে, আবার আমাদের সমৃদ্ধির পথ দেখায়। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে উপকূলের গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়টি সাদা চোখে ততটা অনুভব না হলেও যে কোনো বড়ো ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর বিষয়টি আমাদের নজরে আসে খুব ভালোভাবে। পরিস্থিতি সামাল দিতে তখন জাতীয় পর্যায়ের অন্য খাতের বাজেট কাটছাঁট করে উপকূলে দিতে হয়। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পরও স্বাধীন বাংলাদেশ অনেকগুলো বড়ো ঘূর্ণিঝড়ের মুখোমুখি হয়েছে। এগুলোর মুখোমুখি ইতোমধ্যে আমরা হয়েছি। কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে অজানা আরও বিষয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আমাদের সামনে আসছে নতুন নতুন সমস্যা। সেই সমস্যার প্রথম শিকার উপকূলীয় জনগোষ্ঠী। দেশের সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য, দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উপকূল অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীমা। এখানেই উপকূল সাংবাদিকতার গুরুত্ব।

এককথায় বলা যায়, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য যে সাংবাদিকতা, সেটাই উপকূল সাংবাদিকতা। আরও বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে–উপকূল সাংবাদিকতা উপকূলীয় জনজীবনের কথা বলে, উপকূলের সুশাসনে নজর রাখে, উপকূলের পরিবর্তন অনুসরণ করে, উপকূলের জলবায়ু

পরিবর্তনের প্রভাবগুলো পর্যবেক্ষণে রাখে, উপকূলের উন্নয়ন-অপউন্নয়নের খোঁজ রাখে, পরিবেশ বন ও সুন্দরবন বিষয়ে খোঁজ রাখে, প্রান্তিকের সরকারি সেবার দিকে খোঁজ রাখে, উপকূলের অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার খোঁজ রাখে, দুর্যোগ-বিপন্নতার পাশে থাকে, উপকূলের সংকট তুলে ধরে, উপকূলের সম্ভাবনার দিকে নজর রাখে প্রভৃতি। একসময় শুধু ঘূর্ণিঝড়ের গতিবিধি লক্ষ করে গণমাধ্যম উপকূলে নজর রাখত। ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা কতটা, এর ওপর নির্ভর করত উপকূলের জন্য কতটুকু স্থান বরাদ্দ হবে। ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত পেয়ে কেন্দ্রীয় গণমাধ্যমের ক্যামেরা চোখ ফেরাত উপকূলে। উপকূলের জন্য ছিল ইভেন্টভিত্তিক সাংবাদিকতা। কিন্তু এখন সেই ধারণা অনেকটাই বদলেছে। শুধু ঘূর্ণিঝড়ে নয়, স্বাভাবিক সময়েও উপকূলের মানুষের জীবন যে কতটা অস্বাভাবিক, তা জানার আগ্রহ বেড়েছে মানুষের মধ্যে। গণমাধ্যমও বিশেষ খবরের জন্য উপকূলের দিকে নজর দিচ্ছে।

উপকূল সাংবাদিকতা নিয়ে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের সাংবাদিক ও গণমাধ্যমে আগ্রহ অনেক বেড়েছে। বিশেষ করে, তরুণ সাংবাদিকদের মধ্যে উপকূল ইস্যুতে বিশেষ প্রতিবেদন তৈরির আগ্রহ অনেক বেড়েছে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, অনলাইন এবং রেডিয়ো মাধ্যমের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায়, 'উপকূল' শব্দটির ব্যবহার অনেক বেড়েছে। শিরোনামে আসছে উপকূল শব্দটি। অথচ পাঁচ-দশ বছর আগে গণমাধ্যমে এ শব্দটির এতটা ব্যবহার আমরা দেখিনি। অঞ্চলভিত্তিক ইস্যু নিয়ে সাংবাদিকতার ধারণা অনেক পুরোনো হলেও 'উপকূল সাংবাদিকতা'র ধারণা সূচিত হওয়ার সময়কাল খুব বেশি দিনের নয়। ইতোমধ্যে ধারণাটি বেশ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। উদীয়মান তরুণ সাংবাদিকরা উপকূল থেকে একটি ভালো স্টোরি করার জন্য উদ্‌গ্রীব। আগ্রহী সাংবাদিকরা বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ পেয়ে উপকূল সাংবাদিকতার বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। অন্যান্য প্রান্তিক ইস্যুর পাশাপাশি উপকূল ইস্যুতে সাংবাদিকতা প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)। উপকূল অঞ্চলের সাংবাদিকদের ইস্যুভিত্তিক স্টোরি নির্মাণে দক্ষ করে তুলতে 'উপকূল সাংবাদিকতা' প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিল প্রতিষ্ঠানটি। এর মাধ্যমে প্রায় ৩০০ সাংবাদিক দক্ষতা অর্জন করেছেন।

বাংলাদেশে উপকূল সাংবাদিকতার যাত্রা খুব দীর্ঘ না হলেও পৃথিবীজুড়ে উপকূল সাংবাদিকতার চর্চা অনেক পুরোনো। যুক্তরাষ্ট্র (বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা) যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে উপকূল সাংবাদিকতা অথবা উপকূলের ইস্যুতে গণমাধ্যমে ব্যাপক কাজ হচ্ছে অনেক আগে থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে পৃথকভাবে উপকূল ইস্যু নিয়ে অধ্যায় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই শিক্ষার্থীরা উপকূল ইস্যুতে সাংবাদিকতার চর্চা করার সুযোগ পান। উপকূল অঞ্চলের ইস্যুর ওপর ভর করে গড়ে উঠেছে অনেক গণমাধ্যম এবং সেগুলো যথারীতি ব্যাপক জনপ্রিয়তাও পাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন উপকূলে কমিউনিটি পর্যায়ে সংবাদপত্র, অনলাইন, টেলিভিশন, রেডিয়ো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি পাশের দেশ ভারতেও অনেক কমিউনিটি মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠেছে। এই গণমাধ্যমগুলো কমিউনিটির উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে কমিউনিটি মিডিয়া হিসাবে আমরা কয়েকটি রেডিয়ো স্টেশন দেখতে পাই। সেগুলো নিজ নিজ অবস্থানে থেকে ভূমিকা রাখছে। তবে ভবিষ্যতে উপকূল ইস্যুতে বাংলাদেশে সাংবাদিকতা প্রসারের বড়ো সম্ভাবনা আছে।

উপকূলের বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্য

উপকূল সাংবাদিকতার মূল বিষয়ে প্রবেশের আগে 'উপকূল' বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের উপকূল নির্ধারণ করা হয়েছে তিনটি নির্দেশকের ভিত্তিতে। এগুলো হচ্ছে: ঘূর্ণিঝড়ের বাতাস, জোয়ার-ভাটার বিস্তৃতি ও লবণাক্ততার প্রভাব। ১৯টি জেলা উপকূলের আওতাভুক্ত। এর মধ্যে তিনটি জেলা অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ। এগুলো হচ্ছে–যশোর, নড়াইল ও গোপালগঞ্জ। এ তিন জেলায় উপকূলীয় প্রভাব ততটা পড়ে না। কিন্তু বাকি ১৬টি জেলার অধিকাংশ এলাকা সরাসরি উপকূল প্রভাবিত। উপকূলভিত্তিক সংকটগুলো এই জেলাগুলোয়ই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

বিষয় ও বৈশিষ্ট্যের নিরিখে উপকূল অঞ্চলকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো: পূর্ব উপকূল, মধ্য উপকূল এবং পশ্চিম উপকূল। ৫টি জেলা রয়েছে পূর্ব উপকূলে। এগুলো হলো: কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর। উপকূলের অন্য দুই অংশ থেকে পূর্ব উপকূলের বিষয় ও বৈশিষ্ট্য কিছুটা আলাদা; আবার কিছু বিষয় রয়েছে কমন। পূর্ব উপকূলের একটি অংশ পাহাড় অধ্যুষিত। বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালী, একমাত্র প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিন, পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত এই পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। পূর্ব উপকূলের সঙ্গে আছে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের সীমান্ত। সীমান্ত, পাহাড়, সমুদ্রসৈকতকেন্দ্রিক অনেক সংবাদের ইস্যু আছে উপকূলের এই অংশে। এছাড়া নদীভাঙন, সমুদ্র, সমুদ্রকেন্দ্রিক জীবন, মাছ ধরা, পর্যটন প্রভৃতি ইস্যু রয়েছে এই অঞ্চলে। মধ্য উপকূলের ৮টি জেলা বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ভোলা, ঝালকাঠি, বরিশাল, চাঁদপুর ও শরীয়তপুর। উপকূলের এই অংশে সবচেয়ে বড়ো ইস্যু দ্বীপ-চর, যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি। ইলিশ আহরণের একটি বড়ো ক্ষেত্র এই অঞ্চল। ইলিশের অভয়াশ্রম হিসাবে পরিচিত এলাকাগুলো উপকূলের এই অংশে। নদীভাঙনও আছে এই অংশে। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতসহ অনেক পর্যটন সম্ভাবনার এলাকা আছে উপকূলের এই অংশে। পশ্চিম উপকূলে রয়েছে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা। উপকূলের এই অংশে আছে বিশ্ব-ঐতিহ্য হিসাবে পরিচিত ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন। সুন্দরবনকেন্দ্রিক জীবিকানির্বাহ করে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ। সুন্দরবন ঘিরে আছে অনেক ধরনের খবরের ইস্যু। পশ্চিম উপকূলে চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষের খ্যাতি আছে। ঘনঘন ঘূর্ণিঝড় আঘাত করায় গোটা অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। আবাসন, জীবিকা, কৃষির ক্ষেত্রে নানান সংকট দেখা দিয়েছে। সুপেয় খাবার পানির সংকট ক্রমেই তীব্র হচ্ছে।

প্রতিনিয়ত বহুমুখী প্রতিবন্ধকতার ভেতর দিয়ে এই এলাকার মানুষ জীবিকানির্বাহ করছে। দুর্যোগে সব হারাচ্ছে; তারপরও আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। সংকট ও সমস্যা যেমন এই এলাকায় রয়েছে, তেমনই অবারিত সম্ভাবনাও রয়েছে উপকূলজুড়ে। জাতীয় অর্থনীতিতে উপকূল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিপুলসংখ্যক মৎস্যজীবী সমুদ্র-নদীতে মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করেন। আর তাদের আহরিত মাছ জাতীয় অর্থনীতির বিরাট অংশীদার। উপকূলের উন্নয়ন, সংকট সমাধান, সম্ভাবনা বিকাশ, পর্যটনশিল্প প্রসারসহ বিভিন্ন বিষয়ে গণমাধ্যম ভূমিকা রাখতে পারে।

সরকারের বিভিন্ন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের উপকূল অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। ডেল্টা প্ল্যানের ছয়টি হটস্পটের মধ্যে উপকূল অঞ্চল অন্যতম। উপকূল অঞ্চলের ২৭ হাজার ৭৩৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা ডেল্টা প্ল্যানের আওতায় রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি দেশের বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল ২২ হাজার ৮৪৮, হাওড় ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকা ১৬ হাজার ৫৭৪, পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৩ হাজার ২৯৫, নদী অঞ্চল ও মোহনা ৩৫ হাজার ২০৪ এবং নগর এলাকা ১৯ হাজার ৮২৩ বর্গকিলোমিটার ডেল্টা প্ল্যানের আওতায় রয়েছে। ডেল্টা প্ল্যানের আওতায় দেশের উপকূল অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের

পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। উপকূল অঞ্চলের জন্য সঠিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে 'উপকূল অঞ্চল নীতিমালা' তৈরি হয়েছিল ২০০৫ সালে। এছাড়াও উপকূলের জন্য অনেক ধরনের নীতিমালা ও পরিকল্পনা আছে। এগুলোর সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপকূল সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রেক্ষাপট, গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা

পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জনপদের নাম উপকূল। এই জনপদের মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হচ্ছে। কখনো ঘূর্ণিঝড়ে লন্ডভন্ড, কখনো জলোচ্ছ্বাসে ভাসে। প্রতিবছর দুর্যোগে হাজারো মানুষের প্রাণ যায়। কোটি কোটি টাকার সম্পদহানি ঘটে। চারিদিকে শুধু আতঙ্ক আর আতঙ্ক। উপরন্তু উপকূলের বহু এলাকায় পৌঁছায়নি উন্নয়ন সুবিধা। সরকারি-বেসরকারি সেবা পৌঁছাচ্ছে না সাধারণ মানুষের কাছে। গড়ে উঠেনি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো। রাস্তাঘাট, কালভার্ট, হাসপাতাল কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। নদীভাঙনে বিলীন হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো ভাসমান দিন কাটাচ্ছে। জীবিকানির্বাহে সংকটের শেষ থাকে না। এর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে উপকূলে। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে মানুষজন বসতি বদলাচ্ছে বারবার। এসব ঝুঁকির মধ্যেই বেঁচে আছে উপকূলের প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ। যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতাও এই অঞ্চলের জীবনযাত্রা পিছিয়ে রাখছে। উপকূলের বহু এলাকা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণেই সেখানকার মানুষ কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে। এরই প্রভাব পড়ছে সমাজের নানা স্তরে। অশিক্ষা-অসচেতনতা জনপদের মানুষকে অনগ্রসরতার গণ্ডি পেরোতে দিচ্ছে না। উপকূলের মানুষকে সেসব সংকট থেকে বের হতে সহায়তা করতে পারে উপকূল সাংবাদিকতা।

দেশের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এ অঞ্চলটি পিছিয়ে আছে যুগের পর যুগ। দুর্যোগ এলে সব গণমাধ্যমে হইচই পড়ে যায়। 'সিডর', 'আইলা', 'মহাসেন'-এর কল্যাণে উপকূলের প্রতি গণমাধ্যমের সাময়িক নজর পড়ে উপকূলের প্রান্তিকে। দুর্যোগ সরে গেলে সেসব কথা কারও মনে থাকে না। দ্বীপের খবর কেউ রাখেন না। উপকূলের বিচ্ছিন্ন জনপদের অধিকাংশ খবর পৌঁছায় না রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের কাছে। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারছে না। সেখানকার জেলেরা কীভাবে বেঁচে থাকেন? কৃষক কেন ফসল পান না? শিশু কেন স্কুলে যেতে পারে না? নানামুখী দুর্যোগে মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকে? এসব প্রশ্নের জবাব নেই আমাদের অনেকের কাছেই। আবার থাকলেও আছে শুধু উপরিভাগের তথ্য। ভেতরের তথ্য জানার সুযোগ একেবারেই কম। উপকূলকে এগিয়ে নিতে হলে, সেখানকার মানুষের সংকট কাটাতে হলে এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চাই। তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া, উপকূলের সমস্যা নিয়ে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভাবনার সুযোগ করে দেওয়া, নীতিনির্ধারকদের সামনে সমস্যা সমাধানের পথ বের করে দিতেই উপকূল সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

নিবিড় উপকূল সাংবাদিকতা প্রান্তিকের জেলে-কৃষক-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সব পেশার মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে আনতে পারে। এর মাধ্যমে উপকূলের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব। দুবলারচর, নিঝুমদ্বীপ, মনপুরা, হাতিয়া, শাহপরীর দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন জনপদকে কেন্দ্রের সামনে উপস্থাপন করতে পারে উপকূল সাংবাদিকতা। প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্ন জনপদের মানুষ কী সমস্যায় পড়ছেন, কীভাবেই বা এর সমাধান করছেন–সব বিবরণ প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করতে পারে উপকূল সাংবাদিকতা। খতিয়ে দেখতে পারে কেন প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জন্য সরকারি-বেসরকারি সেবা মিলছে না? কেনই বা তারা পিছিয়ে আছে যুগের পর যুগ? এর সঙ্গে বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণ, সরকারি-বেসরকারি তৎপরতা আর নতুন নতুন ভাবনার খবরাখবর তুলে আনতে পারে উপকূল সাংবাদিকতা। তথ্য প্রচার এবং এ সংক্রান্ত নানামুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া সম্ভাবনাময় অঞ্চলটিকে সামনে নিয়ে আসা সম্ভব। মনে রাখা প্রয়োজন, বারবার কড়া নাড়লেই উপকূলের অন্ধকার দুয়ারে আলো ফেলা সম্ভব। আর সেক্ষেত্রে উপকূল সাংবাদিকতা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

নিবিড় উপকূল সাংবাদিকতা প্রান্তিকের জেলে-কৃষক-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সব পেশার মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে আনতে পারে। এর মাধ্যমে উপকূলের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব

উপকূল সাংবাদিকতায় যেখানে এত সম্ভাবনা ও সুযোগ, সেখানে বাংলাদেশের উপকূল সাংবাদিকতা কতটা এগিয়েছে? সংগত কারণেই এ প্রশ্নটা সামনে এসে দাঁড়ায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উপকূলের খবরের প্রতি এদেশের কেন্দ্রীয় গণমাধ্যমের নজর খুবই কম। বহুমুখী প্রতিবন্ধকতায় উপকূলের মানুষের সংকটের বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত হতে পারেনি। এ কারণে সংবাদকর্মীরাও বিশেষভাবে উপকূল সাংবাদিকতায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন না। ঠিক কেন্দ্রীয় গণমাধ্যমের মতোই উপকূল অঞ্চলে কর্মরত সংবাদকর্মীরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপকূলের কিছু চলমান বিষয়ে খবর তৈরির পর থেমে যান। অনেকে আবার দৈনন্দিন খবরের চাপে উপকূল নিয়ে বিশেষ খবর তৈরির সুযোগ পান না। তাদের পক্ষে শহর ছেড়ে প্রান্তিকের কোনো জনপদে যাওয়াও

সম্ভব হয় না। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, উপকূল অঞ্চলে বেশকিছু স্থানে ভালো লিখিয়ে রয়েছেন, যাঁরা প্রতিনিয়ত প্রান্তিকের মানুষের খবর রাখেন। তবে সে সংখ্যা একেবারেই হাতেগোনা। কিন্তু এ সংখ্যা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের দিক থেকে উৎসাহ একেবারেই কম। উপকূল সাংবাদিকতায় এটিই সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। এ সমস্যার কারণে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একজন সংবাদকর্মীর পক্ষে সেভাবে উপকূলের ইস্যু নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। তবে বাধা থাকবে, সেই বাধা অতিক্রম করে উপকূল সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নিতে হবে। উপকূলের প্রায় প্রতিটি জেলায় রয়েছে দ্বীপ ও চর। ভাঙনকবলিত এলাকা রয়েছে অসংখ্য। এমন অনেক সংকটাপন্ন এলাকা আমি চিনি, যেখানে কখনো কোনো সংবাদকর্মীর পা পড়েনি। পা ফেলেননি সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা কিংবা জনপ্রতিনিধি। কেমন আছেন ওইসব এলাকার মানুষ?

সংবাদের ক্ষেত্র ও বিষয়বৈচিত্র্য

বাংলাদেশের দক্ষিণে সমুদ্রে গা ঘেঁষে জেগে থাকা উপকূল অঞ্চল খবরের বৃহৎ ভান্ডার। খবরের জন্মস্থান উপকূলজুড়ে। অনুসন্ধান, ফিচার, বিশেষ প্রতিবেদন, সম্ভাবনাবিষয়ক প্রতিবেদন, জলবায়ু প্রতিবেদন, কৃষি প্রতিবেদন, শিক্ষা প্রতিবেদন, নারী-শিশুবিষয়ক প্রতিবেদন, দুর্নীতি-অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদন থেকে শুরু করে সব ধরনের প্রতিবেদন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে উপকূল অঞ্চলে। ছোটো পরিসরের আলোচনায় উপকূল অঞ্চলের সব বিষয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। এখানে কিছু বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এখান থেকে সাংবাদিক নতুন নতুন স্টোরির ধারণা পেতে পারেন।

* **জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও বন:** জলবায়ু পরিবর্তন এখন বিশ্বজুড়ে আলোচিত ইস্যু। এর সঙ্গে আছে পরিবেশ ও বন। পরিবেশ সাংবাদিকতা একসময় খুব অবহেলিত ছিল। পরিবেশ বিটের সাংবাদিকদের বলা হতো কোনো খবর নেই বলে তারা ফুল-পাখির সংবাদ লিখে। পরিবেশের সঙ্গে জলবায়ু যুক্ত হয়ে এই বিট এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্বজুড়ে পরিবেশ ও জলবায়ু সাংবাদিকতা এখন বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়েছে। উপকূল সাংবাদিকতার বড়ো অংশজুড়ে আছে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও বন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় আগে অনুভব করা হয়। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার মানুষ জলবায়ু সংকটের দিক থেকে প্রথম সারিতে আছে। যদিও সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে তারা শেষের সারিতে। জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও বনসংক্রান্ত অনেক ইস্যু উপকূলে আছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এগুলো নিয়ে স্টোরি তৈরির অনেক সুযোগ আছে।

* **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব:** বিগত কয়েক বছর ধরে লক্ষণীয়, বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের উপকূলে উচ্চ জোয়ারের প্রভাবে জনজীবন ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে। অনেকে সম্পদ হারায়, অনেকে বাড়িঘর স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়। বেড়িবাঁধের বাইরে, নিচু এলাকায় অনেকে ভিটে উঁচু করে বাড়ি তৈরি করেছিলেন। উচ্চ জোয়ারের প্রভাবে তাদের বাড়িঘরও পানিতে ডুবে যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে উপকূলের মানুষের জীবন ও জীবিকায়। জোয়ারের পানি কিংবা লবণপানির তোড়ে নষ্ট হয় ফসল। নদী ও সমুদ্রকেন্দ্রিক জীবিকা ব্যাহত হয়। মানুষের উপার্জন কমে যায়। ফলে অনেক পরিবার শহরমুখী হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব আরও বাড়বে বলে বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা। আর এর প্রভাব সবার আগে উপকূল অঞ্চলেই পড়বে। উপকূল সাংবাদিকতায় এই বিষয়টি এখনই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আগামী দিনে গুরুত্ব আরও বাড়বে।

* **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা মনে এলে প্রথমে আসে উপকূল। দেশ স্বাধীনের আগে ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় বা এরও আগে অনেক ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপকূল অঞ্চল। এর ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত আছে। দুর্যোগের প্রভাব থেকে রেহাই পায়নি উপকূল; বরং সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপদের মাত্রা বাড়ছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, নদীভাঙন, পাহাড়ধস প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপদের মুখে পড়ে বাংলাদেশের উপকূলের মানুষ বাড়িঘর হারায়, জীবিকা হারায়, অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। প্রাকৃতিক বিপদের মুখে পড়ে বহু সম্পৎশালী পরিবার নিঃস্ব হয়; জীবিকানির্বাহের জন্য নিজের এলাকা ছেড়ে শহরে চলে যেতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব পড়ে জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানির সংকট, চাষাবাদ সংকট, বাঁধের সংকট প্রভৃতি নানান সংকট সামনে আসে। উপকূলের প্রাকৃতিক বিপদকে কেন্দ্র করে অসংখ্য প্রতিবেদন ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

* **জীবন ও জীবিকা:** যুগ যুগ উপকূলের মানুষ বিভিন্ন পেশায় জীবিকানির্বাহ করে আসছে; এখনো করছে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন কারণে উপকূলের মানুষের জীবন-জীবিকায় মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। উপকূল অঞ্চলের বিভিন্ন পেশাজীবী তাদের পেশা বদল করতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেকে শহরে চলে যাচ্ছেন; যোগ দিচ্ছেন ভারী কাজে। কৃষক টিকে থাকতে পারছেন না চাষাবাদে, মৎস্যজীবীরা জীবিকানির্বাহ করতে পারছেন না মাছ ধরা পেশায়। অধিকাংশ পেশাজীবীর জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে। এসব সংকটের মধ্যেও হয়তো কোনো কোনো পেশার মানুষ খুব স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকানির্বাহ করছেন; আছে ইতিবাচক অনেক গল্প। পেশা এবং মানুষের জীবন ও জীবিকা বিষয়গুলো খবরের ইস্যু হতে পারে।

* **অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত:** উপকূলজুড়েই বহুমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত। এসব কাজে জড়িত আছে লাখ লাখ মানুষ। পুরুষের পাশাপাশি কাজ করেন নারীও। মাছ ধরা, কৃষি, চিংড়িচাষ, লবণচাষ, শুঁটকিশিল্প, পর্যটনশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে রয়েছে বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ঘিরে অনেক সংকট যেমন আছে, তেমনই আছে বিপুল সম্ভাবনা। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে উপকূলে ছোটো-বড়ো অনেক খামার গড়ে উঠেছে; যেগুলো বিপুল আর্থিক সমৃদ্ধির হাতছানি দেয়। এসব বিষয় উপকূল সাংবাদিকতার ইস্যু হতে পারে। উপকূল নিয়ে যারা কাজ করছেন, এই ক্ষেত্র থেকে তারা অনেক স্টোরির ধারণা পাবেন।

* **নাগরিক সেবা:** নাগরিক সেবা উপকূল অঞ্চলে সাংবাদিকতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি আছে নাগরিকদের জন্য। সরকারি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে সেফটিনেট প্রোগ্রাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অধীনে আছে

১০টি বিশেষ প্রকল্প। এসব প্রকল্পের সুবিধা প্রান্তিকের মানুষের কাছে কতটা পৌঁছাচ্ছে, না পৌঁছালে কী কারণে পৌঁছাচ্ছে না–এসব বিষয় নিয়ে স্টোরি হতে পারে। কোনো কর্মসূচি ইতিবাচক পরিবর্তন করলে, তা নিয়েও স্টোরি হতে পারে।

* **যোগাযোগ অবকাঠামো:** যোগাযোগের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা উপকূল সাংবাদিকতার জন্য একটি অন্যতম ইস্যু। ভৌগোলিক কারণেই উপকূলের অধিকাংশ এলাকায় যোগাযোগ অপ্রতুলতা রয়েছে। উপকূলের অসংখ্য দ্বীপ-চর এবং কয়েকটি দ্বীপ উপজেলার সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের একমাত্র যোগাযোগ নৌপথ। নৌপথনির্ভর যোগাযোগব্যবস্থা অনেক সময় নাগরিকদের জীবন-জীবিকা প্রভাবিত করে এবং মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। দ্বীপ-চর থেকে মুমূর্ষু রোগীকে শহরের চিকিৎসকের কাছে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় চিকিৎসকের কাছে পৌঁছানোর আগে রোগীর মৃত্যু ঘটে। দুর্যোগের সময় মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। যাতায়াত সংকটের প্রভাব পড়ে শিক্ষা, ব্যাবসাবাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এগুলো অনুসন্ধান করলে দুর্দান্ত সব স্টোরি হতে পারে।

অথবা বেড়িবাঁধটি যেভাবে হওয়ার কথা ছিল, সেভাবে হচ্ছে না। বড়ো বড়ো প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। এর ফলে মানুষের দুর্ভোগ কমেনি; বরং বেড়েছে। এসব নিয়ে স্টোরি পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

* **সম্প্রদায়/গোষ্ঠীর খবর:** উপকূলজুড়ে অনেক সম্প্রদায়/গোষ্ঠী রয়েছে। পশ্চিম উপকূলে আছে বনজীবী; যারা সুন্দরবনকেন্দ্রিক জীবিকানির্বাহ করে। বছরের কিছু সময় তারা কর্মহীন থাকে, কিছু সময় কাজ করে। আদিবাসী মুন্ডাসহ আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে পশ্চিম উপকূলে। বাঘবিধবা একটি ছোটো জনগোষ্ঠী, যাদের স্বামী বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছে। এদের জীবনের লড়াই অনেক কঠিন। মধ্য উপকূলে একটি ভাসমান জনগোষ্ঠী রয়েছে; যারা পরিবারসহ নৌকায় বসবাস করে এবং মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করে। উপকূলের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে আছে আরেকটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়, যারা বেদে নামে পরিচিত। পূর্ব উপকূলে রয়েছে জলদাস সম্প্রদায়, যারা বংশপরম্পরায় মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল। এছাড়াও আছে আরও অনেক সম্প্রদায়। উপকূলের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলো বেশি সংকট মোকাবিলা করে। জলবায়ু পরিবর্তন তাদের সংকট আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এগুলো নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্টোরি হতে পারে।

> সাংবাদিকতা অথবা যে কোনো কাজের জন্যই প্রস্তুতি আবশ্যক। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রস্তুতি অপরিহার্য। প্রস্তুতি যত ভালো হবে, প্রতিবেদন ততই মানসম্পন্ন হবে। কখনো কখনো প্রতিবেদন তৈরির সময়ের চেয়ে প্রস্তুতিতে বেশি সময় দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে

* **দুর্নীতি-অনিয়ম-অপরাধ:** দুর্নীতি, অনিয়ম, অপরাধ অন্য এলাকার মতো উপকূল অঞ্চলেও বিদ্যমান। পূর্ব উপকূলে একসময় মানব পাচার উপকূলের জন্য বড়ো ইস্যু ছিল। এখন যদিও মানব পাচার কমেছে; কিন্তু মাদকের বাণিজ্য এখনো আছে। অপরাধীচক্র উপকূলের বন উজাড়ের সঙ্গে জড়িত। দস্যুরা সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। সুন্দরবন একসময় দস্যুদের অভয়ারণ্য ছিল। এখন যদিও অপরাধীর সংখ্যা কমেছে; কিন্তু একেবারে নির্মূল হয়নি। অন্যান্য স্থানের মতো উপকূলেও সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতি আছে। খাসজমিতে আছে ভূমিদস্যুর চোখ। জোর করে জমি দখল, এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা, আরও কত কী–এ সংক্রান্ত অনেক ইস্যু আছে উপকূলে। উপকূল নিয়ে কর্মরত সাংবাদিক এদিকে নজর রাখতে পারেন।

* **উন্নয়ন এবং অপ-উন্নয়ন:** উপকূল অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন হচ্ছে। রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, ভবন প্রভৃতি নানান কিছু। এর পাশাপাশি আবার অপ-উন্নয়নও হচ্ছে। রাস্তাটি প্রয়োজন নেই; কিন্তু হচ্ছে। কালভার্ট-স্লুইস গেট প্রয়োজন নেই; কিন্তু হচ্ছে।

* **সুন্দরবন:** উপকূল সাংবাদিকতার জন্য সুন্দরবন একটি বড়ো ক্ষেত্র। বিশ্ব-ঐতিহ্য এই ম্যানগ্রোভ বাংলাদেশের পশ্চিম উপকূলে দাঁড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক ঢাল হিসাবে। বিগত এক-দেড় দশক ধরে ঘূর্ণিঝড়গুলো বাংলাদেশের পশ্চিম উপকূলে আঘাত করেছে। এই ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত বুক পেতে সামলে নিয়ে সুন্দরবন তার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ দেখিয়েছে। সুন্দরবন না থাকলে পশ্চিম উপকূলের জনজীবনের ব্যাপক ক্ষতি হতো। তারপরও বিভিন্নভাবে সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক বিপদের কারণে সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অন্যান্য মানবসৃষ্ট বহুমুখী কারণে সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে সম্প্রতিককালে সুন্দরবনকে সুরক্ষার উদ্যোগও চোখে পড়ে। সুন্দরবন ঘিরে রয়েছে নানামুখী কর্মকাণ্ড। বনজীবীরা জীবিকার জন্য সুন্দরবনে যায়। শীত মৌসুমে দুবলারচরে শুঁটকি উৎপাদন ঘিরে অসংখ্য মানুষের সমাগম ঘটে। হাজারো মানুষের জীবিকার পথ দেখায় সুন্দরবন। সুন্দরবনকে ঘিরে অনেক ধরনের স্টোরি করার সুযোগ আছে।

* **দ্বীপ-চর:** বাংলাদেশের উপকূলজুড়ে অসংখ্য দ্বীপ-চর আছে। প্রাকৃতিকভাবেই এগুলো গড়ে ওঠে আবার বিলীন হয়। দ্বীপ-চরগুলো সাংবাদিকদের জন্য খবরের বড়ো ক্ষেত্র। উপকূলের ছয়টি উপজেলা সদর দ্বীপে অবস্থিত। ১৮টি ইউনিয়ন রয়েছে দ্বীপে। মূল ভূখণ্ড ভেঙে দ্বীপ গড়ছে; সেই সঙ্গে ওলটপালট হচ্ছে মানুষের জীবন ও জীবিকা। ভাঙনকবলিত মানুষ দ্বীপে আশ্রয় নেয়। তারা সেখানে সম্পদ গড়ে। কিন্তু সেই সম্পদ হারিয়ে তারা আবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সম্পৎশালী পরিবারগুলো বসবাসের স্থান খুঁজে ফেরে অন্যের বাড়িতে। দ্বীপ-চরগুলোয় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দৃশ্যমান। এর পাশাপাশি উপকূলের দ্বীপ-চরে সম্ভাবনাও আছে। কৃষি, খামার, মৎস্যচাষ, গবাদি পশুর বিচরণক্ষেত্র প্রভৃতি অনেক ধরনের সম্ভাবনা আছে দ্বীপ-চর এলাকায়। এসব বিষয় নিয়ে অনেক ধরনের স্টোরি তৈরি হতে পারে।

* **দিবস:** উপকূলের জন্য দিবসকেন্দ্রিক অনেক ধরনের প্রতিবেদন আছে। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আঘাত করেছিল বাংলাদেশের উপকূলে। নিশ্চিহ্ন হয়েছিল গ্রামের পর গ্রাম। একেকটি জনপদ মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ওই ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় ১০ লাখ মানুষ। কয়েক বছর ধরে এই দিনটিকে 'উপকূল দিবস' হিসাবে পালন করা হচ্ছে। সুতরাং এই দিনটি ঘিরে প্রতিবছর একটি ভালো প্রতিবেদন হতে পারে। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডর, ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলা, ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আম্পানসহ আরও অনেক ঘূর্ণিঝড় দিবস রয়েছে, সেগুলো নিয়ে প্রতিবেদন হতে পারে।

* **সম্ভাবনা ও সুযোগ:** উপকূলের দিকে চোখ ফেরালে সম্ভাবনা ও সুযোগের চেয়ে সংকটের দিকেই আমাদের চোখ পড়ে বেশি। কিন্তু গোটা উপকূল অঞ্চল সম্ভাবনার বিরাট ক্ষেত্র। পূর্ব উপকূল থেকে শুরু করে পশ্চিম উপকূল অবধি আমরা অনেক সম্ভাবনার ক্ষেত্র দেখতে পাই। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক বিপদের ফলে সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানবসৃষ্ট অনেক কারণ রয়েছে সম্ভাবনাগুলো ধ্বংস হওয়ার। সম্ভাবনা বিকাশের চেয়ে সম্ভাবনা ধ্বংস হয়–এমন প্রকল্পের সংখ্যা বেশি চোখে পড়ে। অথচ সম্ভাবনা বিকাশের সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিতে পারলে এক উপকূল থেকেই দেশ অনেক সমৃদ্ধ হতে পারে। এসব বিষয় নিয়ে অনেক স্টোরি তৈরির সুযোগ আছে।

প্রস্তুতি, কলাকৌশল ও স্টোরি পরিকল্পনা

সাংবাদিকতা অথবা যে কোনো কাজের জন্যই প্রস্তুতি আবশ্যক। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রস্তুতি অপরিহার্য। প্রস্তুতি যত ভালো হবে, প্রতিবেদন ততই মানসম্পন্ন হবে। কখনো কখনো প্রতিবেদন তৈরির সময়ের চেয়ে প্রস্তুতিতে বেশি সময় দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রতিবেদন লেখার বিষয়টি যদি অপরিচিত বা অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত হয়, তাহলে প্রস্তুতির দিকে আরও মনোযোগ দিতে হবে। এখানে প্রস্তুতির কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি:

* **সাধারণ প্রস্তুতি:** কেউ যদি মনস্থির করে থাকেন, আমি এই কাজটি করব, তাহলে প্রথমেই তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে। তাকে দেখতে হবে উপকূলে কাজে যাওয়ার জন্য তাঁর সব উপকরণ আছে কি না, উপকূলে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা, দীর্ঘপথ হাঁটা, দুর্যোগের মুখে পড়লে তা মোকাবিলা করা–প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তুতি আছে কি না। এককথায়–একজন সাংবাদিককে প্রথমেই সামগ্রিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। উপকূল অঞ্চলে সাংবাদিকতা করার জন্য সাধারণ প্রস্তুতি নিয়ে আরও ভাবতে হবে।

* **নিরাপত্তা আগে:** দুর্নীতি-অনিয়মসংক্রান্ত সংবাদ অনুসন্ধানে গেলে স্বাভাবিকভাবেই একজন সাংবাদিকের নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকে। যেকোনোভাবে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে উপকূলে অন্য নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা জরুরি। উপকূলে কাজ করতে গেলে আপনাকে নদীপথ পেরোতে হবে। দুর্যোগের সময় নদীপথ অতিক্রম করতে হতে পারে। উপকূলে কাজ করতে হলে নিজের নিরাপত্তার জন্য একজন সাংবাদিকের সাঁতার জানা খুব জরুরি। প্রাকৃতিক বিপদের কথা বিবেচনায় রেখে লাইফ জ্যাকেট সঙ্গে রাখা যেতে পারে।

* **ভূগোল জ্ঞান/ যাতায়াত পথ চেনা:** উপকূল সাংবাদিকতার জন্য ভূগোল জ্ঞান থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমনটা ওপরে আলোচনা করা হয়েছে, বাংলাদেশের উপকূলের তিনটি অংশ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের। একেক এলাকায় একেক ধরনের ইস্যু। ভৌগোলিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থান নির্বাচন সহজ হবে। একই সঙ্গে যাতায়াত পথ চেনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি কোন এলাকায় যাচ্ছি, সেখানে যাওয়ার মাধ্যম কী, থাকার ব্যবস্থা কী হবে প্রভৃতি আগে থেকে জানা থাকলে কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।

* **তথ্য সংরক্ষণের প্রস্তুতি/যন্ত্রপাতি-উপকরণ:** উপকূল সাংবাদিকতা অথবা যে কোনো সাংবাদিকতার জন্যই তথ্য সংরক্ষণের প্রস্তুতি গুরুত্বপূর্ণ। উপকূল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি হয়তো কোনো দ্বীপে যাচ্ছেন, যেখানে বিদ্যুৎ না থাকতে পারে। জেনারেটরের সাহায্যে হয়তো আপনার যন্ত্রপাতিতে চার্জ দিতে হবে। আগে থেকেই আপনাকে সেই ধরনের প্রস্তুতি রাখতে হবে। ক্যামেরার অতিরিক্ত ব্যাটারি থাকলে পূর্ণ চার্জ দিয়ে নিতে পারেন। যন্ত্রপাতিগুলো আগে থেকেই চেক করে নেওয়া ভালো। কেননা দ্বীপে অথবা বিচ্ছিন্ন কোনো এলাকায় কোনো যন্ত্রপাতি সারানোর সুযোগ পাবেন না হয়তো। ছবি, ভিডিয়ো সংরক্ষণের জন্য এক্সটার্নাল হার্ডডিস্ক সঙ্গে থাকা জরুরি। কেননা এমন সময় হতে পারে, আপনার সব ডিভাইস ফুল। ছবি, ভিডিয়ো রাখার জায়গা নেই। তখন এক্সটার্নাল হার্ডডিস্ক আপনাকে সাহায্য করবে।

* **স্বাভাবিক আচরণ:** প্রান্তিকের মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ সাংবাদিকতার একটি আলাদা সৌন্দর্য। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। শহর থেকে আসা মানুষ হিসাবে আপনি যদি তাদের থেকে নিজেকে আলাদা রাখেন, দূরত্ব বজায় রাখেন, তাহলে সঠিত তথ্য পাওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। প্রয়োজনে মাঠে দু-একদিন অবস্থান করে মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে। কখনো কখনো নোটবুক-বলপেন ছাড়াই কথা বলুন। অনেক সময় নোটবুক-কলম ব্যবহার করলে মানুষ ভয় পায়। এজন্য স্মরণশক্তি প্রখর রাখুন। আলাপের বিষয়গুলো পরে নোটে লিখে নিন।

* **মানুষ চেনার ক্ষমতা:** প্রান্তিকে, অজানা স্থানে কোনো ইস্যু নিয়ে কাজ করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই মানুষ চেনার ক্ষমতা থাকতে হবে। মানুষ চিনতে না পারলে আপনি বিভ্রান্ত হতে পারেন, আপনার অনুসন্ধান ভুল হতে পারে। কোন তথ্য কার কাছ থেকে নিলে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে, সেটাও আপনাকে বুঝতে হবে। কিছু দুষ্ট মানুষ আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভুল তথ্য দিতে পারে। কিছু বন্ধু খুঁজে নিন, যারা বিশ্বস্ত, আপনাকে সঠিক তথ্য দেবে। এজন্য মাঠে যাওয়ার আগেই খোঁজখবর নিয়ে যেতে পারেন। মাঠের মানুষের সঙ্গে আপনার যত সখ্য গড়ে উঠবে, আপনি তত তথ্য পাবেন, স্টোরি লিংক পাবেন।

* **নেটওয়ার্কিং জোরদার করা:** আপনার নেটওয়ার্ক যত বেশি, আপনি তত ভালো সাংবাদিক–এ কথাটা উপকূল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য। উপকূলে সাংবাদিকতা করার জন্য কয়েক স্তরের নেটওয়ার্ক থাকা জরুরি। তৃণমূল স্তরের পেশাজীবীদের নেটওয়ার্ক থাকা দরকার, যে নেটওয়ার্কে মৎস্যজীবী, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু মাঠের পেশাজীবীরা থাকবে। স্থানীয় কমিউনিটির নেতাদের সঙ্গে আরেকটি নেটওয়ার্ক থাকতে হবে। আরেকটি নেটওয়ার্ক থাকা দরকার জনপ্রতিনিধিদের। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গেও একটি নেটওয়ার্ক থাকা দরকার। এই নেটওয়ার্কগুলো থাকলে একজন সাংবাদিকের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। সহজে অনেক তথ্য পাবেন।

* **ফলোআপ/আপডেট:** উপকূল হচ্ছে পরিবর্তনশীল একটি এলাকা। ফলে এই অঞ্চলে সাংবাদিকতা করতে ফলোআপ প্রতিবেদন তৈরির চিন্তা বিবেচনায় রাখতে হবে। উপকূলের কোনো একটি দ্বীপ কিংবা কোনো একটি গ্রাম ফলোআপ করে প্রমাণভিত্তিক স্টোরি করতে পারলে তা নিঃসন্দেহে সাড়া ফেলবে। তাছাড়াও কোনো পেশাজীবী ব্যক্তি অথবা কোনো গোষ্ঠী/সম্প্রদায় নিয়েও ফলোআপ স্টোরি করা যেতে পারে। কিন্তু এই ফলোআপ স্টোরির জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি থাকতে হবে। এই ফলোআপ স্টোরিগুলো পরিবর্তনের প্রমাণভিত্তিক স্টোরি করতে সহায়তা করবে। এছাড়া উপকূল সাংবাদিকতা করার জন্য আপডেট থাকা জরুরি। এ বছর বর্ষাকালে জোয়ারের পানি কোথায় উঠেছিল, নদীভাঙন কতটা তীব্র ছিল, বাস্তুচ্যুত মানুষ কোথায় গেল–এইসব বিষয়ে একজন সাংবাদিকের আপডেট থাকা খুব জরুরি।

* **যথাযথ পরিকল্পনা/ আত্মবিশ্বাস:** ভালো প্রতিবেদন পরিকল্পনা একটি মানসম্পন্ন প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়ক হতে পারে। পরিকল্পনা যত ভালো হবে, প্রতিবেদন ততই ভালো হবে। কিন্তু সাধারণত প্রতিবেদন পরিকল্পনায় বেশি সময় দেওয়া হয় না। পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে আমি কাজটি কীভাবে করব, কোথায় কোথায় যেতে হবে। নিচের আলোচনায় স্টোরি পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। পরিকল্পনার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসও একজন সাংবাদিককে অনেকখানি এগিয়ে দেয় তাঁর কাজে।

এবার আসি স্টোরি পরিকল্পনার আলোচনায়। যে কোনো স্টোরির জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা খুবই জরুরি। স্টোরি পরিকল্পনাকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন: (১) রিপোর্টারভিত্তিক পরিকল্পনা; (২) প্রতিবেদনভিত্তিক পরিকল্পনা; এবং (৩) খণ্ডিত পরিকল্পনা। রিপোর্টারভিত্তিক পরিকল্পনা মানে একজন রিপোর্টার একটি নির্দিষ্ট সময়জুড়ে কী কাজ করবেন, সেই পরিকল্পনা। এটা হতে পারে বার্ষিক, ষাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক অথবা মাসিক। রিপোর্টার এই সময়ে কী কী স্টোরি তৈরি করবেন, তার একটি রূপরেখা তৈরি করে রাখতে পারেন। এতে কোনো বিষয় বাদ পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়, স্টোরির জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়। ধরা যাক, ১৫ নভেম্বর সিডর দিবস। রিপোর্টারভিত্তিক পরিকল্পনায় এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলে স্টোরি তৈরির জন্য আগেই প্রস্তুতি নেওয়া যাবে। কিন্তু এ বিষয়টি যদি মাত্র একদিন বা দুইদিন আগে মনে পড়ে, তখন ভালো প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হবে না। একইভাবে আমরা একটি প্রতিবেদন তৈরির জন্য পরিকল্পনা করতে পারি, প্রতিবেদনে কী কী লাগবে প্রভৃতি। আবার প্রতিবেদনের মধ্যে একটি সাক্ষাৎকার অথবা কোনো এলাকার সরেজমিন তথ্যের জন্য পৃথক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারি। এগুলোকে খণ্ডক পরিকল্পনা বলা যেতে পারে।

উপকূল হচ্ছে পরিবর্তনশীল একটি এলাকা। ফলে এই অঞ্চলে সাংবাদিকতা করতে ফলোআপ প্রতিবেদন তৈরির চিন্তা বিবেচনায় রাখতে হবে। উপকূলের কোনো একটি দ্বীপ কিংবা কোনো একটি গ্রাম ফলোআপ করে প্রমাণভিত্তিক স্টোরি করতে পারলে তা নিঃসন্দেহে সাড়া ফেলবে

* **বিষয় নির্বাচন:** স্টোরি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিষয় নির্বাচন। বিষয় নির্বাচনের সময় আমাকে ভাবতে হবে বিষয়টি যথোপযুক্ত কি না। আরও ভাবতে হবে এ বিষয়ে কাজ করতে আপনার আগ্রহ আছে কি না। পরিকল্পনার সময় আপনাকে বিবেচনায় রাখতে হবে এ বিষয়ে কাজ করতে আপনার সক্ষমতা কতটা আছে। প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত মিলবে কি না, তা বিবেচনা করতে হবে বিষয় নির্বাচনের সময়ই। আগেই চিন্তা করতে হবে কাজটি সময়মতো সম্পন্ন করা সম্ভব কি না। বিবেচনায় রাখতে হবে প্রয়োজনীয় সময় ও অর্থ পাওয়া যাবে কি না।

* **লক্ষ্য নির্ধারণ/ফোকাস ঠিক করা:** পিন পয়েন্ট অথবা ফোকাস ঠিক করতে হবে পরিকল্পনা তৈরির আগেই। রিপোর্টের নির্দিষ্ট লক্ষ্য (ফোকাস) নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে মাঝপথে গিয়ে স্টোরির কাজ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ফোকাস ঠিক করতে গিয়ে একই স্টোরিকে ভেঙে একাধিক স্টোরি করার প্রয়োজন পড়তে পারে। একাধিক স্টোরি হলে তথ্য সংগ্রহের ধরন ও এলাকাও বদলে যেতে পারে। একাধিক রিপোর্ট হলে সিরিজ প্রতিবেদনের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। ফোকাস ঠিক করার সময়েই আপনার বিবেচনায় আসবে, এ বিষয়ের সঙ্গে কোন কোন পক্ষ জড়িত আছে, প্রত্যেক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। পক্ষগুলোর নাম তালিকাভুক্ত করে রাখুন। ফোকাস ঠিক করার সময়েই আপনার বিবেচনায় আসবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যভান্ডারের তালিকা। সম্ভাব্য সংশ্লিষ্ট তথ্য-উৎস লিস্ট লিপিবদ্ধ করে রাখুন।

* **সরেজমিন এলাকা নির্বাচন:** নিশ্চয়ই স্টোরির জন্য আপনি কোনো এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শনে যাবেন। স্টোরির আলোকে একটি এলাকা নির্ধারণ করুন, কোথায় গেলে স্টোরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত মিলবে। এবার সরেজমিন এলাকার জন্য পৃথক পরিকল্পনা করুন। সরেজমিন এলাকা থেকে আপনি যে তথ্য চান, তার একটি চেকলিস্ট তৈরি করুন। সরেজমিন এলাকা নিয়ে পৃথক পরিকল্পনা বা চাহিদেয় তথ্যের চেকলিস্ট না থাকলে অনেককিছু বাদ পড়ার আশঙ্কা থাকে। একটি প্রতিবেদনের জন্য একাধিক সরেজমিন এলাকা হতে পারে। মাঠ সরেজমিনে যাওয়ার আগে ওই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জেনে নিন। সরেজমিন এলাকায় দুই-একদিন অবস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখুন। কোনো এলাকায় অবস্থান না করলে সেই এলাকা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া কঠিন। এলাকার যাতায়াতব্যবস্থা সম্পর্কে আগেই জেনে নিন।

* **সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ:** মাঠ সরেজমিনের জন্য একটি চেকলিস্ট আগেই তৈরি করা উচিত। মাঠ সরেজমিনের উপকরণ সঙ্গে রাখতে হবে। ক্যামেরা, নোটবুক, বলপেন প্রভৃতি আছে কি না, আরেকবার চেক করে নিন। ক্যামেরার ব্যাটারি, মেমোরি কার্ড ঠিক আছে কি না দেখে নিন। ছবি, ভিডিয়ো স্টোরেজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে কি না দেখে নিন। শুধু তথ্য নয়, পর্যবেক্ষণগুলো নোট করুন। স্টোরিতে পর্যবেক্ষণ নোট থেকে তৈরি হওয়া একটি অনুচ্ছেদ আপনার স্টোরিকে জীবন্ত করতে পারে। সরেজমিনে মাঠে গিয়ে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলতে হবে, কমিউনিটির অন্যদের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। মাঠে বিভিন্ন পেশাজীবীর সঙ্গে কথা বলতে হবে, তথ্য ক্রস চেক করতে হবে। নোট-রেকর্ডিং, ভিডিয়ো করা, আলোকচিত্র ধারণ করতে হবে সরেজমিনে গিয়ে। মনে রাখবেন, একই কাজের জন্য দ্বিতীয়বার মাঠে আসা আপনার জন্য কঠিন হবে। তাই প্রয়োজনীয় যা কিছু সংরক্ষণে নিয়ে নিন। যাদের সঙ্গে কথা বলছেন, তাদের মোবাইল নম্বর নোটে রাখুন, যাতে প্রয়োজন হলে পরে তাদের সঙ্গে কথা বলা যায়।

* **মাঠ জরিপ:** মাঠ জরিপ রিপোর্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক তথ্য-উপাত্ত, কিংবা গবেষণার ফলাফল আপনি পাবেন। কিন্তু রিপোর্টের প্রয়োজনে একজন রিপোর্টার নিজেই বিষয়ভিত্তিক মাঠ জরিপ করতে পারেন। হাতে পর্যাপ্ত সময় রেখে বিষয়ের আলোকে জরিপ প্রশ্নমালা করতে পারেন। প্রশ্নমালা তৈরিতে বিশেষজ্ঞ সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। রিপোর্টার নিজে অথবা স্থানীয় যুবকদের এই জরিপকাজে লাগানো যেতে পারে। নিজের করা জরিপ প্রতিবেদনের ফলাফল আপনার রিপোর্টে যুক্তি উপস্থাপনে সহায়ক হবে, রিপোর্ট পাঠকের কাছে আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

* **গবেষণা তথ্য:** প্রতিবেদনের জন্য অবশ্যই গবেষণা তথ্য প্রয়োজন হবে। আপনি যে বিষয়ে স্টোরি করছেন, এ বিষয়ে আগে কী কী গবেষণা হয়েছে, তার খোঁজ নিন। গবেষণা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, গবেষণা প্রতিবেদন সংগ্রহ করুন। গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, তাদের সঙ্গে কথা বললে পেতে পারেন নতুন কিছু তথ্য। গবেষণার খোঁজ করার জন্য অনলাইনের সহায়তা নিতে পারেন। আপনার প্রতিবেদনে এ বিষয়ে এক বা একাধিক গবেষণা তথ্য সংযুক্ত করতে পারলে প্রতিবেদনটি আরও সমৃদ্ধ হবে।

* **সরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য:** আপনি যে বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন, সেই বিষয়ে সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে খোঁজ নিন। কী প্রকল্প, প্রকল্পের উদ্দেশ্য কী, বরাদ্দ কত প্রভৃতি অনুসন্ধান করুন। খোঁজ নিন প্রকল্পে কী করার কথা ছিল, কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক কী প্রভৃতি। প্রকল্প গ্রহণের আগে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত নেওয়া হয়েছে কি না, প্রকল্পটি বাস্তবসম্মত ছিল কি না–এসব বিষয়ে খোঁজ নিন। প্রকল্পটি সফলতা পেয়ে থাকলে সেটাও উল্লেখ করুন।

* **নীতিমালার খোঁজ:** যে কোনো বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য অথবা অনুসন্ধানের আগে পরিকল্পনা তৈরির জন্যও নীতিমালার খোঁজ নেওয়া জরুরি। খোঁজ নিন এ বিষয়ে নীতিমালা আছে কি না, থাকলে নীতিমালায় কী আছে। নীতিমালার বাস্তবায়ন মাঠে কী দেখা যাচ্ছে খোঁজ নিন। নীতিমালা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী অবহিত কি না, সে বিষয়টিও একজন সাংবাদিক হিসাবে আপনার খতিয়ে দেখা দরকার।

* **সংশ্লিষ্টদের কথা:** এটা তো ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না, রিপোর্ট মানেই তো সব পক্ষের কথা একত্রিত করা। সরেজমিনে মাঠে গিয়ে কথা বলুন প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে। তাদের সাক্ষাৎকার, কেস স্টাডি গ্রহণ করুন। মাঠের যত বেশি মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন, বিষয়টি ততটাই পরিষ্কার হবে আপনার কাছে। মাঠের মানুষের কথার সূত্র ধরে কথা বলুন সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে। সংশ্লিষ্ট বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা এবং আরও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মহলের বক্তব্য নিন। প্রতিবেদনে যত বেশি পক্ষ যুক্ত করা যায়, ততটাই সমৃদ্ধ হবে আপনার স্টোরি।

* **তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ:** এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলোআপ প্রতিবেদন করা অথবা আপনার প্রতিবেদন নিয়ে কেউ চ্যালেঞ্জ করলে সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত খুবই কাজে লাগবে। প্রতিবেদনের জন্য আপনি অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, ছবি তুলেছেন, ভিডিয়ো চিত্র ধারণ করেছেন। নোটবুকে লিখেছেন অনেক তথ্য। এই সবকিছু ডিজিটালি অথবা ম্যানুয়ালি সংরক্ষণ করা খুব জরুরি।

উপকূল সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ

উপকূল সাংবাদিকতায় চ্যালেঞ্জ আছে। প্রান্তিকের দুর্গম জনপদে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহে সময় ও অর্থের প্রয়োজনই সবার আগে দেখা দেয়। তারপরও নিজের প্রয়োজনেই উপকূল অঞ্চলে কর্মরত প্রত্যেক সংবাদকর্মীর উচিত নিজ নিজ এলাকাটি ভালোভাবে চেনা। একটি এলাকা ভালোভাবে চেনা থাকলে যে কোনো প্রতিবেদন লেখা সহজ হয়ে যায়। তাছাড়া সরেজমিনে এলাকায় গেলে লেখার ধরনটাও বদলে যায়। বিষয়টি আরও সহজভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব। উপকূলের জেলাগুলোর মধ্যে প্রায় সব জেলায়ই কমবেশি দুর্গম এলাকা রয়েছে। এসব এলাকার তথ্যাবলি নীতিনির্ধারক মহলে পৌঁছাতে হলে উপকূলের সাংবাদিকদেরই সবার আগে নজর ফেলতে হবে।

সাংবাদিকতা পেশাটাই তো চ্যালেঞ্জের। ঝুঁকি আর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়ার নামই উপকূল সাংবাদিকতা। পশ্চিম উপকূলের সুন্দরবনের গা ঘেঁষে জেগে থাকা উপকূলীয় জেলা বাগেরহাটের মোংলায় রয়েছে দুবলারচর। এর আওতায় রয়েছে অনেক চর। শুঁটকি উৎপাদনকে কেন্দ্র করে শীত মৌসুমে সেখানে হাজারো মানুষের ভিড় জমে। এছাড়াও কিছু মানুষ সেখানে নিয়মিত জীবিকার পথ খোঁজেন। কিন্তু একজন সংবাদকর্মী চাইলেই খুব সহজে সেখানে সংবাদ সংগ্রহে যেতে পারেন না। সুন্দরবনের আওতায় থাকায় দুবলারচরে যেতে বন বিভাগের অনুমতি লাগে। তাছাড়া ওই চরে যাওয়ার জন্য সংকট যানবাহনের। দ্বীপজেলা ভোলার দিকে চোখ ফেরালে চোখে ভাসে অসংখ্য চরের দ্বীপচরের ছবি। কটা দ্বীপে গিয়ে কজন সাংবাদিক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারছেন? সেখানকার অনেক দ্বীপ এখনো অধিকাংশ সংবাদকর্মীর কাছেই অচেনা।

পূর্ব উপকূলে চোখ ফেরালেও অনেক স্থানের একই চিত্র। কক্সবাজারের কুতুবদিয়ার আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের কুদিয়ার টেক তো সমুদ্রে হারিয়েই গেল! এরই কাছের গ্রাম তাবালরচরও হারানোর পথে। সেখানকার মানুষের দুরবস্থা কজন সংবাদকর্মী নিজের চোখে দেখেছেন? বাড়ি হারানো মানুষগুলো কোথায় গেলেন? কজন সংবাদকর্মীর কাছে সে খবর আছে? ক্রমাগত পরিবেশ বিপর্যয়ে কক্সবাজারের মহেশখালীর ধলঘাটা ইউনিয়ন, টেকনাফের সাবাং ইউনিয়নের মানুষের কেবলই ছোটাছুটি। কে কার খোঁজ রাখে! আবার আসি ভোলার দ্বীপ চরনিজামের দিকে। দ্বীপ উপজেলা মনপুরা থেকে তিন ঘণ্টা ট্রলার চালালে ওই দ্বীপের দেখা মেলে। সেখানকার মানুষের কাছে পৌঁছায় না কোনো ধরনের নাগরিক সুবিধা। কীভাবে জীবনটা পার করছেন ওই এলাকার মানুষ? কীভাবেই বেড়ে উঠছে সেখানকার আগামী প্রজন্ম? কী খোঁজ আছে উপকূলের সাংবাদকর্মীদের কাছে? পটুয়াখালীর আন্ডারচর, চরমোন্তাজ, চরকাজল, চরলতা, রাঙ্গাবালীর সরেজমিন তথ্য-উপাত্ত কজন সংবাকর্মীর কাছে আছে? ভাঙন রোধে অর্থ বরাদ্দের পরও লক্ষ্মীপুরের কমলনগরের লুধুয়ার বড়ো অংশ অল্পদিনের ব্যবধানে বিলীন হয়ে গেল। নিঃস্ব হলো বহু মানুষ। কই, এ সম্পর্কে খুব বেশি প্রতিবেদন তো চোখে পড়ল না!

সময়, অর্থ ও সুযোগ–এই তিনটি প্রশ্ন বারবারই আসে। তবে উপকূলের সাংবাদিকদের দৃষ্টিভঙ্গিটাও বড়ো বিষয়। এর সঙ্গে সাংবাদিকের সততা, একনিষ্ঠতা, কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা এবং নিজের ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয়টিও জরুরি। উপকূলীয় কোনো শহরে রাজনৈতিক হানাহানি, সড়ক দুর্ঘটনা, এমনকি কোনো এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে আঘাত হানার বিষয়টিকেও পুরোপুরি উপকূল সাংবাদিকতার আওতায় ফেলতে পারি না। নদীভাঙনে তাৎক্ষণিক কয়েকটি পরিবার নিঃস্ব হওয়া, কিংবা জলোচ্ছ্বাসে কোনো এলাকার ফসলের ক্ষতির মতো বিষয়কেও উপকূল নিয়ে ব্যতিক্রমী সাংবাদিকতার আওতায় ফেলা যায় না। এজন্যই উপকূলের সাংবাদিকতায় ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় চোখের (থার্ড আই) ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপকূলের সংবাদকর্মীকে নতুন খবরের সন্ধান দেবে, যা ইতঃপূর্বে কখনো বিস্তারিতভাবে লেখা হয়নি। প্রত্যেক সংবাদকর্মীর ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয়টিও জরুরি। আমি কী চাই? আমি কি আর দশজন সংবাদকর্মীর মতো দৈনন্দিন খবর নিয়েই ব্যস্ত থাকব? নাকি নতুন কিছু সন্ধান করব? আমার লক্ষ্যই এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে দেবে। আর এক্ষেত্রে উপকূল ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রত্যেক সংবাদকর্মীর ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয়টিও জরুরি। আমি কী চাই? আমি কি আর দশজন সংবাদকর্মীর মতো দৈনন্দিন খবর নিয়েই ব্যস্ত থাকব? নাকি নতুন কিছু সন্ধান করব? আমার লক্ষ্যই এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে দেবে। আর এক্ষেত্রে উপকূল ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়

একা সংবাদকর্মীর ওপর সব দায়দায়িত্ব ফেলে রাখলেও চলবে না। উপকূল সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি মোকাবিলায় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমের নীতিনির্ধারণ ও রিপোর্টিং পরিকল্পনায় উপকূলের ইস্যুগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। গণমাধ্যমগুলো উপকূল নিয়ে পৃথক বিট যেমন তৈরি করতে পারে, তেমনই বিভাগ চালু করতে পারে। পাশাপাশি উপকূল ইস্যুতে উপকূলের সংবাদকর্মীদের পেশার মানোন্নয়নে নজর দিতে হবে।

লেখক: আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুসন্ধানী উপকূল ও জলবায়ু সাংবাদিক।
আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় কন্ট্রিবিউটিং রিপোর্টার হিসাবে কর্মরত

পরিবেশ ও জলবায়ুসংক্রান্ত সাংবাদিকতার শুরুর কথা

মিনহাজ উদ্দীন

গণমাধ্যমে পরিবেশ, জলবায়ু বা প্রাকৃতিক দুর্যোগসংক্রান্ত সংবাদ নতুন কিছু নয়। সভ্যতায় সাংবাদিকতা চর্চার শুরু থেকেই এ বিষয়ক সংবাদের যাত্রা শুরু, যা এখনো স্বমহিমায় বহমান। মানুষের জীবনে পরিবেশ ও জলবায়ুর সরাসরি প্রভাব রয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতার এই যুগে ক্ষতিকর এই প্রভাব আরও পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান। জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবজনিত কারণে বিশ্ব এখন সংকটাপন্ন। যাকে আমলে নিয়ে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে জাতিসংঘ। সংস্থাটির The Climate Crisis–A Race We Can Win শিরোনামের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "Climate change is the defining crisis of our time and it is happening even more quickly than we feared. But we are far from powerless in the face of this global threat. As Secretary-General António Guterres pointed out in September, 'the climate emergency is a race we are losing, but it is a race we can win." সংস্থাটির বিবৃতিতে সঠিক নির্দেশনাই তুলে ধরা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন সত্যিকার অর্থেই একধরনের বড়ো সংকট। যে সংকট কল্পনার চেয়েও দ্রুত ঘনীভূত হচ্ছে। আর এই সংকট মোকাবিলার সময় সত্যিই দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। সংস্থাটির মহাসচিব উল্লেখ করেছেন, জলবায়ুসংক্রান্ত অতি জরুরি বিষয়ে আমরা পরাজিত হতে চলেছি; কিন্তু এটা এমন একটি প্রতিযোগিতা যাতে আমরা জিততে পারতাম। জাতিসংঘের বার্তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গণমাধ্যমে উঠে আসছে অবধারিতভাবেই।

পরিবেশ তথা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করা এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত সাংবাদিকতার শুরু হয় গত শতকের নব্বইয়ের দশকে। এ সময় বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন তথা কার্বন নির্গমন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু হয়। তবে আরও একটু পেছনের দিকে তাকানো

> জাতিসংঘের বার্তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গণমাধ্যমে উঠে আসছে অবধারিতভাবেই

যেতে পারে, যখন বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তর পরিসরে সংবাদ পরিবেশন শুরু করে সংবাদমাধ্যমগুলো। জাতিসংঘের অধীনে প্রথম The first World Climate Conference (WCC) অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালে। এরপর আসে আরেকটি বড়ো পরিবর্তন। ১৯৮৮ সালে গঠিত হয় The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). জাতিসংঘের অধীনে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আন্তসরকার সমন্বয়ে এই প্যানেলটি গঠিত হওয়ার পরপরই জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বৈশ্বিক সচেতনতা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জলবায়ু সম্মেলন। এই সম্মেলনের মাধ্যমেই জলবায়ু পরিবর্তন তথা কার্বন নির্গমন নিয়ে বিশ্বব্যাপী নতুন আলোচনা শুরু হয়। যার ভিত্তিতে শুরু হয় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনভিত্তিক সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার। এই ধারা আরও বিকশিত হয় কিয়েটো প্রটোকল (Kyoto Protocol) স্বাক্ষরিত হওয়ার পর। কিয়েটো জাপানি একটি শহর। এই শহরেই জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত এই দলিল স্বাক্ষরিত হয়। যাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জন্য কার্বন নির্গমনের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল।

এরই ধারাবাহিকতায়, পরিবেশ তথা জলবায়ু নিয়ে সাংবাদিকতার বড়ো এই বৈশ্বিক প্ল্যাটফরম হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলন। জাতিসংঘের অধীনে ১৯৯৫ সালে বার্লিনে শুরু হওয়া এই সম্মেলন ২০২২ সালে (কপ২৭: কনফারেন্স অব দ্য পার্টিস) অনুষ্ঠিত হচ্ছে মিশরের সবুজ শহর নামে পরিচিত অবকাশকেন্দ্র শার্ম-আল-শেখে। ১৩ দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিশ্বের ১৯৮টি দেশের রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানরা যোগ দিচ্ছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের দলনেতা হিসাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সঙ্গে আছেন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সরকারি-বেসরকারি উন্নয়নকর্মী এবং একদল দক্ষ সাংবাদিক। ১৬ নভেম্বর এ সম্মেলনে বাংলাদেশের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রচার ও প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের প্রথম সারির স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল 'চ্যানেল টোয়েন্টিফোর' ও অন্যান্য গণমাধ্যমের অন্যতম প্রধান খবর ছিল–জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। চলতি কপ২৭ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ অন্যান্য এলডিসিভুক্ত দেশের জন্য লস অ্যান্ড ড্যামেজের অর্থায়নের বিষয়ে ঘোষণা আসার কথা ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে ধনী দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি রাখেনি। ফলে কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। সম্মেলনে এ বিষয়ে হতাশার কথা তুলে ধরেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পরিবেশ, বন ও জলবায়ুবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী। এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে সাবের হোসেন চৌধুরী ও পরারাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন জানান, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিবছর বাংলাদেশে অন্তত ছয় লাখ মানুষ তাদের জীবিকা হারাচ্ছেন। কিন্তু এত বড়ো অভিঘাত সহ্য করার পরও ধনী দেশগুলো লস অ্যান্ড ড্যামেজের বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে গড়িমসি করছে। (সূত্র: চ্যানেল টোয়েন্টিফোর, সন্ধ্যা ৭টার সংবাদ, ১৬ নভেম্বর ২০২২)

ওপরের আলোচনা থেকে অনেকটাই নিশ্চিত হওয়া যায়, পরিবেশ বা জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সাংবাদিকতার সূত্রপাত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত সম্মেলনকে কেন্দ্র করেই। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় H-net Review জার্নালে মার্ক নিউজিল (Mark Neuzil) প্রকাশিত 'A Sweeping History of Environmental Journalism' শিরোনামের নিবন্ধে। নিউজিলের এই নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে জলবায়ুসংক্রান্ত সাংবাদিকতা বিকাশ মূলত আজ থেকে ৪০ বছর আগে। অর্থাৎ গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট থমাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্ক নিউজিল উল্লেখ করেছেন, নব্বইয়ের দশকে পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক সাংবাদিকতা সূচনার ক্ষেত্রে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের একধরনের বড়ো ভূমিকা ছিল। কারণ এ সময় বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে মানুষের মতো গাছপালা, বনভূমি, পশুপাখি, পানি, পাহাড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের নিজস্ব অধিকার রয়েছে। অধিকার রয়েছে বিকশিত হওয়ার, অধিকার রয়েছে টিকে থাকার। আর এই টিকে থাকার অধিকারের প্রেক্ষাপট থেকেই জলবায়ুসংক্রান্ত সাংবাদিকতার যাত্রা শুরু, যা আজ পত্রপল্লবে বিকশিত হয়ে বিশ্বব্যাপী বিরাজ করছে। একই সঙ্গে প্রতিনিয়ত বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে–দ্রুত গলছে মেরু অঞ্চলের বরফ, দ্রুত বাড়ছে সমুদ্রের উচ্চতা, যা দিনদিন বিপদাপন্ন করছে আমাদের বাসভূমি এই বিশ্বকে।

তথ্যসূত্র

১. 'A Sweeping History of Environmental Journalism', by Mark Neuzil,file:///C:/Users/Hp/Desktop/Environmental%20Journalism/review_32167.pdf
২. https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win
৩. https://unfccc.int/kyoto_protocol
৪. file:///C:/Users/Hp/Desktop/Environmental%20 Journalism/Schfer-ClimateChangeandtheMedia.pdf
৫. চ্যানেল টোয়েন্টিফোর, সন্ধ্যা ৭টার সংবাদ, ১৬ নভেম্বর ২০২২

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটি রেডিয়োঃ একটি পর্যবেক্ষণ

মামুন আ. কাইউম

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনায় দুর্যোগ ইস্যুটি এখন গণমাধ্যমের অন্যতম আলোচিত বিষয় হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে। 'গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনডেক্স' এবং জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত আন্তসরকার প্যানেল আইপিসিসি-এর বিবেচনায় বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হিসাবে স্থান পেয়েছে। দেশের নিয়মিত দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে সুনামি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, খরা, নদীভাঙন প্রভৃতি। বিশেষ করে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সাম্প্রতিক সময়ের সুপার সাইক্লোন সিডর, আইলা, মহাসেন, ফণী, সিত্রাং, নার্গিস, বুলবুল, আম্ফান, মোরা, রোয়ানু, ইয়াসসহ বিভিন্ন সময়ে এসব দুর্যোগ উপকূলীয় মানুষের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করেছে। তবে বিভিন্ন গণমাধ্যমের মানুষকে সচেতন করার মাধ্যমে জানমালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমেছে, এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। শুধু সত্তরের ভোলা সাইক্লোনে তিন লাখেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল, যেখানে সাম্প্রতিক সময়ের উপকূলীয় দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তুলনামূলক খুবই কম বলা যায়। অন্যান্য গণমাধ্যমের পাশাপাশি দেশের দুর্যোগকবলিত উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে কমিউনিটি রেডিয়ো। বিশেষ করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি-কালচার ও ভাষা সংরক্ষণের পাশাপাশি দুর্যোগে স্থানীয় ভাষায় সহজবোধ্য তথ্য প্রকাশ দেশের কমিউনিটি রেডিয়ো চালুর আন্দোলনের অন্যতম মূল বিবেচ্য ছিল। দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসাবে জাপান, ইন্দোনেশিয়া, নেপালও কমিউনিটি রেডিয়োকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সফলতার সঙ্গে কাজে লাগাচ্ছে।

বর্তমানে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মোট নয়টি কমিউনিটি রেডিয়ো চালু রয়েছে। এসব রেডিয়ো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার পরও দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে বিদ্যুৎবিভ্রাটের মধ্যে একটানা ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা সম্প্রচার কার্যক্রম অব্যাহতের রেকর্ড তৈরি করেছে। বরগুনা সদরের লোকবেতার, আমতলীর কৃষি রেডিয়ো, সাতক্ষীরার নলতা, খুলনার কয়রার রেডিয়ো সুন্দরবন, কক্সবাজারের

টেকনাফের নাফ রেডিয়ো, সৈকত রেডিয়ো, নোয়াখালীর হাতিয়ার সাগরদ্বীপ, ভোলার মেঘনা রেডিয়ো এবং সীতাকুণ্ডের রেডিয়ো সাগরগিরি। আর্থিক সীমাবদ্ধতায় এই রেডিয়োগুলোর দুয়েকটির সম্প্রচার কার্যক্রম মাঝেমধ্যে বন্ধ থাকার মতো ঘটনাও ঘটেছে। তবে স্টেশনগুলোর কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও শ্রোতা ক্লাবের সদস্যরা দুর্যোগের সময় জনগণকে তথ্য জানানোর পাশাপাশি মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছানো, বিভিন্ন ত্রাণ তৎপরতায় সহায়তাসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ঝড়ো হাওয়া এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অন্যান্য গণমাধ্যম টেলিভিশন, ইন্টারনেট প্রভৃতি ব্যবহার সম্ভব হয় না। এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করে কমিউনিটি রেডিয়ো।

রেডিয়োগুলোয় দুর্যোগের সময় ১৫ থেকে ২০ মিনিট পরপর আবহাওয়া অধিদপ্তরের সবশেষ এবং স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনা সম্প্রচার করা হয়। রেডিয়োগুলোয় নিয়োজিত কর্মী, স্বেচ্ছাসেবীরা দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী সময়ে করণীয় বিষয়ে স্থানীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংবাদ, ম্যাগাজিন, টকশো এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার করে থাকে। মাঝেমধ্যে স্থানীয় সরকারি এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারি কর্মকর্তাদের বাণী, সাক্ষাৎকার, নির্দেশনা সম্প্রচার করে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুত কমিটির (সিপিপি) কর্মকর্তা; কৃষি, স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার প্রচারও এর কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। যেহেতু উপকূলীয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে মাঝি, জেলে ও কৃষকের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে রেডিয়ো শোনায় উদ্বুদ্ধ করতে রেডিয়োগুলোর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে রেডিয়ো দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সতর্ক সংকেত প্রচারের পাশাপাশি দুর্যোগের পর আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে রেডিয়োগুলোয় করণীয়ও আলোচনা করা হয়। দুর্যোগের সময় পাঁচ থেকে সাত নম্বর সতর্ক সংকেতের পর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে বাংলাদেশ বেতারের ফ্রিকোয়েন্সিও এলাকাগুলোয় পাওয়া যায় না। ইন্টারনেট ও ফোনের নেটওয়ার্কও ঠিকমতো কাজ করে না। এমন পরিস্থিতিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক অনুষ্ঠান সার্বক্ষণিক চলতে থাকে। বিশেষ করে কোন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন, ত্রাণ তৎপরতার খবর, পানি বিশুদ্ধ করার উপায়সহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়। দুর্যোগের সময় রেডিয়োগুলো স্থানীয় উপজেলা ও জেলার দুর্যোগের কন্ট্রোল রুম, পানি উন্নয়ন বোর্ড কন্ট্রোল রুম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং জনসাধারণের মধ্যে একধরনের সেতুবন্ধ তৈরি করে। এসব রেডিয়োতে স্বাভাবিক সময়ে প্রতিদিন খবরে আবহাওয়া সংবাদের পাশাপাশি দুর্যোগবার্তাও প্রচার করা হয়ে থাকে। আর দুর্যোগকালীন পাবলিক সার্ভিস অ্যানাউন্সমেন্ট, ঘূর্ণিঝড়সংক্রান্ত বিশেষ বুলেটিন, স্পট, নাটিকা, পুথিপাঠ, জিঙ্গেল, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য ও পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

বরগুনার রেডিয়ো লোকবেতারের মহাসেনের সময়ে সম্প্রচারকৃত বিষয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, রেডিয়োটি দুর্যোগকালীন, দুর্যোগপূর্ব এবং দুর্যোগপরবর্তী সময়ে আলাদা আলাদা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ করে দুর্যোগসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রচারের জন্য রেডিয়োর সম্প্রচারকে আরও শক্তিশালী করতে সাংস্কৃতিক গ্রুপ এবং শ্রোতা ক্লাবকে সংযুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সাংস্কৃতিক গ্রুপটিকে স্থানীয় মানুষের মুখের ভাষায় গান, নাটিকা, পুথিপাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর শ্রোতা ক্লাবগুলো স্থানীয় বাজার, হাট, খেয়াঘাটগুলোয় ইনফর্মাল হলেও সেগুলোয় ফ্রি রেডিয়ো দেওয়া, সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে তথ্য গ্রহণ এবং রেডিয়োতে প্রদানের ব্যবস্থা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে দুর্যোগের তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে কাজে লাগছে। এগুলোর বাইরেও লিফলেটসহ বিভিন্ন যোগাযোগ উপকরণ ব্যবহার করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগে প্রস্তুতির বিভিন্ন বিষয় জানানো হচ্ছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। সাতক্ষীরার রেডিয়ো নলতার ওপর আরেক গবেষণায়ও দেখা যায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে তাপমাত্রার বৃদ্ধি, লবণাক্ততা, নদীভাঙন নিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ধারণার পরিবর্তন আনার কথা উঠে এসেছে।

দুর্যোগের সময় ও পরে সংবাদ, আবহাওয়া বুলেটিন, দুর্যোগবার্তা, টকশো, ম্যাগাজিনের মাধ্যমে জনসাধারণের মনে সাহস জোগানোর পাশাপাশি সঠিক নির্দেশনাও দেওয়া যায়। রেডিয়ো লোকবেতারের এমন সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ম্যাগাজিন 'নানি-নাতির কিচ্ছা', 'উপকূলের জীবন', টকশো 'আমাদের কথা', যেখানে গানবাজনা, তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাই তুলে ধরেন দুর্যোগে ভালো থাকার কৌশলসহ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ, সম্পদ নিয়ে পূর্বাবস্থায় ফেরার নির্দেশনা। মহাসেন চলাকালীন বারবার স্থানীয় জেলা প্রশাসকের বক্তব্য প্রচার করা হয়, যেখানে তিনি স্থানীয় সবাইকে নিরাপদে থাকার পরামর্শের পাশাপাশি সাইক্লোন শেল্টার, মেডিকেল টিমসহ বিভিন্ন প্রস্তুতি সম্পন্নের বিষয়ে অবগত করেন। এসব অনুষ্ঠান স্বল্প সময় (এক-দেড় মিনিট) থেকে ২৫-৩০ মিনিট অব্যাহত ছিল।

যেহেতু কমিউনিটি রেডিয়োতে সরকার সরাসরি সহায়তা দেয় না, তাই এর সম্প্রচার খরচ এবং কর্মীদের বেতনভাতা ও বিদ্যুৎ বিল আয়ের জন্য উদ্যোক্তা সংস্থার ভর্তুকির পাশাপাশি স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। এদিক থেকে দেখা যায়, উপকূলীয় অঞ্চলের রেডিয়োগুলো বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার চাহিদামাফিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন ইস্যুতে টকশো ও অন্যান্য প্রোগ্রাম তৈরি ও সম্প্রচারের মাধ্যমে সফলতার মুখ দেখেছে। ইতোমধ্যে প্ল্যান বাংলাদেশ, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ব্লু গোল্ড, সিডিএমপি, ক্যাটালিস্ট, রেড ক্রিসেন্ট, ইফাদসহ বিভিন্ন সংস্থা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে তাদের চাহিদামাফিক বার্তা প্রচার ও প্রসারে কমিউনিটি রেডিয়োকে গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া হিসাবে ব্যবহার করছে। আবার কমিউনিটি রেডিয়ো নিজেরাও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী তথ্য প্রচারে স্বেচ্ছায় অনেক অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচার করে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মহাসেনের পর ২০১৩ সালে রেডিয়ো লোকবেতার 'ঘুরে দাঁড়াই' নামের একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের ১৬টি পর্ব চালু রাখে, যেখানে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক প্রতিবেদন, দুর্যোগে যারা ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বেঁচেছেন তাদের সাক্ষাৎকার, দুর্যোগকবলিতদের সাক্ষাৎকার এবং ইস্যুভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়েছে। ১৬ পর্বের অনুষ্ঠানে ১২৬ জন স্থানীয় মানুষের বক্তব্য প্রচার করা হয়েছে, যেখানে ৭৫ জন তাদের দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। ১৬ জন সফল ব্যক্তি, যাঁরা দুর্যোগের কবল থেকে নিজের জানমালকে রক্ষা করতে পেরেছেন, তাদের টিপস এবং ৩৫ জন বিষয়সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের দিকনির্দেশনা প্রচার করা হয়েছে। ইস্যুগুলোর মধ্যে ছিল মহাসেনের পর চর্মরোগ, মৎস্য খাত, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষতি ও করণীয় প্রভৃতি। এমন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নদীর ধারে এবং বাড়ির পাশে গাছপালা লাগানোর তথ্য দেওয়া হয়, যাতে দুর্যোগে ঘরবাড়ি রক্ষা করা সম্ভব হয়। দুর্যোগের সময় জীবনরক্ষাকারী পোশাক ও যানবাহন ব্যবহার, শুকনা খাদ্য সঙ্গে রাখা ও সংরক্ষণ; জরুরি ওষুধ, টাকা ও দলিল পলিথিনের মধ্যে রাখা এবং

ঘরবাড়িতে তালা দিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার খাবার পানির টিউবওয়েলের মাথা খুলে রেখে পলিথিনে ঢেকে রাখা, নারীরা পানির মধ্যে গেলে খোঁপা বেঁধে যাওয়া, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সঠিক সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়ার পরামর্শও রেডিয়োগুলোয় দেওয়া হয়ে থাকে।

উপকূলীয় অঞ্চলের স্থানীয় এ কমিউনিটি রেডিয়োগুলোকে শুধু দুর্যোগ নিয়ে কাজ করতে হয় এমনটি নয়। দুর্যোগের বাইরেও আর দশটি রেডিয়োর মতো অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইস্যুগুলো নিয়ে অনুষ্ঠান তৈরি ও সম্প্রচার করতে হয়। এসব করতে গিয়ে রেডিয়োগুলো বেশকিছু সমস্যার সম্মুখীন হলেও এটি বলা যায়, আন্তরিকতার ফলেই রেডিয়োগুলো টিকে আছে। রেডিয়োগুলোর আয় খুব ভালো না হওয়ায় এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থিক অনুদান না থাকায় কয়েকটি রেডিয়োকে ধুঁকে ধুঁকে পথ চলতে হচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবীরা অনেকদিনের স্বেচ্ছাসেবার পর কর্মী হিসাবে নিয়োগ পেলেও সম্মানজনক বেতনভাতা না থাকায় ড্রপআউটও বেশি হচ্ছে। ফলে দেখা যায়, বিভিন্ন সংস্থা থেকে অনেক প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর সেটি আর কাজে লাগছে না। আবার দুর্যোগ বা উপকূল সাংবাদিকতা একটি বিশেষ ধরনের সাংবাদিকতা হলেও এ বিষয়ে দেশে-বিদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবও রয়েছে। যে কারণে কমিউনিটি রেডিয়োগুলোর কর্মীরা এ বিষয়ে ভালো প্রশিক্ষণ পান না। এসব কমিউনিটি রেডিয়ো স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও এদের বেশকিছুর নিজেদের রেডিয়োর বিল্ডিং দুর্যোগ সহনশীল নয়, যা যে কোনো মুহূর্তে ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব কমিউনিটি রেডিয়োর দুর্যোগ অনুষ্ঠান বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কোনো ম্যানুয়াল নেই বললেই চলে। শ্রোতা ক্লাবের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ উপাদানকে কাজে লাগাতে পারলে সত্যিকার কমিউনিটি রেডিয়ো হওয়া সম্ভব। এর জন্য কিছু মোটিভেশনের প্রয়োজন, যেমন: নির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ, বিনামূল্যে রেডিয়ো ও ব্যাটারি এবং চার্জের ব্যবস্থা, বার্ষিক সমাবেশের আয়োজন প্রভৃতি। এত সীমাবদ্ধতার মধ্যেই উপকূলবাসীর জীবনে উপকূলীয় অঞ্চলের কমিউনিটি রেডিয়োগুলো আশীর্বাদ হিসাবে কাজ করছে, এমনটা বলাই যায়। দুর্যোগের সময়, দুর্যোগের আগের প্রস্তুতি এবং দুর্যোগের পরের পরামর্শ, দিকনির্দেশনা, বাস্তবতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উপকূলবাসী দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাচ্ছে। ছোটো ছোটো পরামর্শগুলো উপকূলবাসী বিশ্বাস করে তাদের কার্যক্রম এবং জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হচ্ছেন। এরই মধ্যে কমিউনিটি রেডিয়োগুলো স্থানীয়দের সরাসরি যোগাযোগ, মোবাইল ফোন, খুদে বার্তা, চিঠিপত্রের মাধ্যমে উপকূলবাসীর প্রত্যাশা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিয়ো অ্যান্ড কমিউনিকেশনের (বিএনএনআরসি) ২০১৭ সালের কমিউনিটি রেডিয়ো শ্রোতা জরিপের ফলাফলেও দেখা যায়, উপকূলীয় অঞ্চলের শ্রোতার দুর্যোগকবলিত এলাকার লোকজন কমিউনিটি রেডিয়ো ব্যবহার করে আরও বেশি সচেতন ও উপকৃত হয়েছেন। এসবের মধ্য দিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে। কমিউনিটি রেডিয়োগুলো তাদের সীমাবদ্ধতাকে পেছনে ফেলে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলবে, উপকূলবাসীর আরও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে–এমন প্রত্যাশা পূরণ হোক।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। লেখকের এমফিল গবেষণার ইস্যু ছিল উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটি রেডিয়োর ভূমিকা

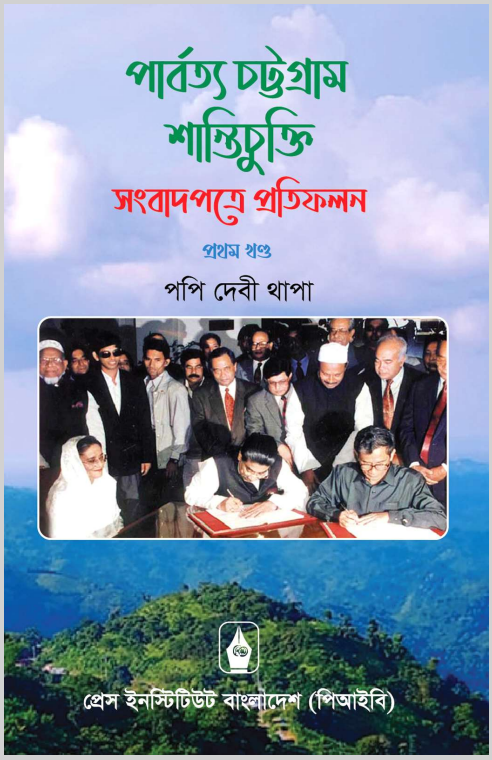

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ ও গণমাধ্যমের করণীয়

আবুজার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতা সত্ত্বেও প্রকৃতিকে বশে আনা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রকৃতিকে বৈরী করে তুলছে। পৃথিবীতে আজ একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, লেখালেখি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রতিবাদ, মানববন্ধন প্রভৃতি সংঘটিত হচ্ছে; আর তা হলো জলবায়ু পরিবর্তন। বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রার দেশ হিসাবে পরিচিত হলেও বিগত কয়েক বছরে তাপমাত্রার অস্বাভাবিক আচরণ সেই পরিচিতি ম্লান হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত হ্রাস পাচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের মৌসুম এবং ধরন পরিবর্তিত হয়েছে (জাকির হোসেন, ২০২০)। বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া এবং অসময়ে বৃষ্টিপাত কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের শস্য ও ফসল উৎপাদনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে; এতে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে গিয়ে খরায় আক্রান্ত হচ্ছে বিপুলসংখ্যক মানুষ। এর মধ্যে উত্তরাঞ্চলের জনসাধারণই বেশি। কারও কারও মতে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ খরায় উদ্বাস্তু হবে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ (বাশার, ২০২২)।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশসহ সমুদ্রতীরের বেশ কয়েকটি দেশে সামনের দিনে মিঠাপানির তীব্র সংকট দেখা দেবে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পাবে এবং অনেক এলাকায় সুপেয় পানির অভাব হবে। বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলে এই অভাব হবে প্রকট। অন্যদিকে লোনাপানির আগ্রাসনে উপকূলীয় এলাকায়ও সুপেয় পানির তীব্র সংকট হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্রের লোনাপানি স্থলভাগের কাছাকাছি চলে আসছে, এতে লবণাক্ততা বেড়ে গিয়েছে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বিপুল এলাকা (রায়, ২০১৬)। বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দশম। এরকম অকস্মাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের প্রায় ৮ শতাংশেরও বেশি নিম্নাঞ্চল ও প্লাবনভূমি আংশিক অথবা স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়বে (বিশ্বাস, ২০২১)। আবার সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে তলিয়ে যাওয়া অঞ্চল থেকে ২০৫০

সাল নাগাদ ৩ কোটি মানুষ গৃহহীন হতে পারে। বাংলাদেশে একাধারে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা সমস্যা, হিমালয়ের বরফ গলার কারণে নদীর দিক পরিবর্তন, বন্যা প্রভৃতি সবদিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রাও অনেক বাড়বে (ইসলাম চৌধুরি, ২০২১)।

গণমাধ্যম জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ উপস্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সাধারণ জনগণ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন, বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট এবং ব্লগ বা আইপিসিসির প্রতিবেদনগুলো পড়ে না। যদিও তাত্ত্বিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বিজ্ঞানের 'তথ্যগুলো' সংবাদপত্র ও টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলোয় সরলভাবে প্রতিবেদন করা উচিত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মিডিয়া সংস্থার সম্পাদকীয়গুলো যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া উচিত; কিন্তু মাধ্যমগুলো রাজনৈতিক সংবাদের আড়ালে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ করে না (কার্ল, ২০১৮)। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের মিডিয়া 'অতিরিক্ততা'ও এমন একটি ব্যবস্থা, যা জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিতে সংশয় প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনে জনসাধারণের ধারণা এবং মিডিয়া প্রতিবেদনের মধ্যে একটি জটিল সম্পর্ক বিরাজমান। এমতাবস্থায় বর্তমান প্রবন্ধে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের করণীয় কী কী, আর কোন কোন বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জনসাধারণ সচেতন হতে পারবে, সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন বলতে তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ার ধরনে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনকে বোঝায়। এ পরিবর্তনগুলো সৌরচক্রের বিভিন্নতার মাধ্যমে হতে পারে। কিন্তু ১৮০০-এর দশক থেকে, মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চালক হয়ে উঠেছে; প্রাথমিকভাবে কয়লা, তেল এবং গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো। জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোয় গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন তৈরি করে, যা পৃথিবীর চারপাশে আবৃত একটি কম্বলের মতো কাজ করে, যাতে সূর্যের তাপ আটকে রাখে এবং তাপমাত্রা বাড়ায়। গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনে জলবায়ু পরিবর্তনের যে কারণ বিদ্যমান তা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মিথেন গ্যাস (হার্টেল, বার্ক ও লোবেল, ২০১০)। জলবায়ু হচ্ছে কোনো অঞ্চলের আবহাওয়া বা বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলোর দীর্ঘদিনের (কমপক্ষে ৩০ বছরের) গড়। জলবায়ু পরিবর্তন বলতে, ৩০ বছর বা এর বেশি সময়ে কোনো জায়গার গড় জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদি ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তন বোঝায়। একটি নির্দিষ্ট এলাকার তাপমাত্রা বা বৃষ্টিপাতের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকেও বোঝায় (ইব্রাহিম ওজদেমির ২০২২)।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক গঠনই এমন–কোথাও কোথাও ভূভাগ যথেষ্ট ঢালু। ভূতাত্ত্বিকভাবে দেশটি থেকে উত্তর দিকে রয়েছে সুউচ্চ হিমালয় পার্বত্যাঞ্চল, যেখান থেকে বরফ গলা পানির প্রবাহে সৃষ্ট বড়ো বড়ো নদী (গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা প্রভৃতি) বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবহমান এবং নদীগুলো গিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বর্ষাকালে নদীবাহিত পানির প্রবাহ বেড়ে গেলে নদী উপচে পানি লোকালয়ে পৌঁছে যায় এবং দেশটি এভাবে প্রায় প্রতিবছরই বন্যায় আক্রান্ত হয় (হোসেন, ২০২১)। অনেক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ওপর জলবায়ুর পরিবর্তন নির্ভর করে। যেসব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় জলবায়ুর পরিবর্তন হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন গতিশীল প্রক্রিয়া, সৌর বিকিরণের মাত্রা, পৃথিবীর অক্ষরেখার দিক পরিবর্তন কিংবা সূর্যের তুলনায় পৃথিবীর অবস্থান (সিফাত, ২০২০)। বর্তমান সময়ে মনুষ্যজনিত গ্রিনহাউজ গ্যাসের ফলে পৃথিবীর উষ্ণায়ন জলবায়ু পরিবর্তনের একটি অন্যতম কারণ। যেটি কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধিতে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে ধরা হয়। আর তাপমাত্রা বাড়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে।

বিশেষ কোনো অঞ্চল বা জনগোষ্ঠী নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের মুখে পড়েছে সারা বিশ্বের মানুষ। এটি ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে, এর প্রভাব শুধু অনুন্নত দেশগুলো ভোগ করবে। বিশেষ করে গত ২০ বছরে এই প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা থেকে আমেরিকা মহাদেশেও। বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচকের (সিআরআই) এক গবেষণায় দেখা যায়, ২০ বছরে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের কুফলে মারা গেছে ৫ লাখ ২৮ হাজারেরও বেশি মানুষ। আর এর সরাসরি ফলাফল হিসাবে আবহাওয়া বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে ১১ হাজারটি। অতিখরা, অতিবৃষ্টি, প্রলয়ংকরী ঝড়, তীব্র শীত, অসহনীয় তাপপ্রবাহ, ভয়াল বন্যা ও ভূমিধস আমাদের জানিয়ে দেয় জলবায়ু পরিবর্তন এক কঠিন বাস্তবতা, এক মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ (ইউনুস, অন্যান্য, ২০১৮)।

জলবায়ু সাংবাদিকতা

জলবায়ু সাংবাদিকতা, জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য, কারণ এবং প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে, মূল্যায়ন করে, নির্বাচন করে এবং উপস্থাপন করে। সেই সঙ্গে এটি প্রশমিত করার উপায় এবং প্রযুক্তিগত মিডিয়ার মাধ্যমে সেগুলো সাধারণ এবং বিশেষজ্ঞ দর্শকদের কাছে বিতরণ করে। এটি অনেক মানুষের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বর্তমানে জলবায়ু সাংবাদিকতার আশপাশের মিডিয়া ইকো-সিস্টেম পরিবর্তিত হচ্ছে, অর্থনৈতিক অবস্থা আরও কঠোর হয়ে উঠছে, আরও বেশি যোগাযোগকারীরা বিতর্কে যোগ দিচ্ছেন এবং সামাজিক মিডিয়া যোগাযোগের সামর্থ্য পরিবর্তন করছে। প্রথমত, এটি দেখায় যে জলবায়ু সাংবাদিকতার সাংগঠনিক এম্বেডিং পরিবর্তিত হচ্ছে, বিশেষজ্ঞ রিপোর্টার দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে, আরও কঠোর পরিস্থিতিতে কাজ করছে এবং অনলাইনে জন্ম নেওয়া সংবাদ মিডিয়া এবং জলবায়ু সাংবাদিকতায় বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট সাইটগুলোর আবির্ভাব। দ্বিতীয়ত, এটি দেখায় যে জলবায়ু সাংবাদিকদের জন্য উপলব্ধ ভূমিকার পরিসর বৈচিত্র্যময় হয়েছে, যার মধ্যে 'গেটকিপিং' থেকে 'কিউরেটিং' ভূমিকায় পরিবর্তন হয়েছে। তৃতীয়ত, এটি নির্দেশ করে যে জলবায়ু সাংবাদিকদের তাদের উৎসের সঙ্গে সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের তথ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এখনো তেমন গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে (মার্লান, ২০২১)।

জলবায়ু পরিবর্তন ও গণমাধ্যম

বিশ্বে ১৯৯০ সালের তুলনায় এখন উল্লেখযোগ্যভাবে গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপাদন করা হয়। বর্তমানে গ্রিনহাউজ গ্যাসের উৎপাদন দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এই গ্যাস জলবায়ু পরিবর্তনের প্রথম ও প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। গণমাধ্যম এই জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের মতো এজেন্ডা সেট করার ক্ষমতা রাখে। গণমাধ্যমগুলোয় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে কাভারেজ, আজ অবধি কম রয়েছে (সিফাত, ২০২১)। গণমাধ্যম পারে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদের মতো পরিবেশগত সমস্যাগুলোর পাশাপাশি প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর ওপর ফোকাস করতে, যা বর্তমানে পৃথিবীর অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে। মানবতার ভবিষ্যৎ হিসাবে গণমাধ্যমে জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য জনগণের নজরে আনা হয়। এর মধ্যে কিছু বিষয়গুলো সত্যিই উদ্‌বেগজনক, যার ওপর ফোকাস করা

> গণমাধ্যম পারে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদের মতো পরিবেশগত সমস্যাগুলোর পাশাপাশি প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর ওপর ফোকাস করতে, যা বর্তমানে পৃথিবীর অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে। মানবতার ভবিষ্যৎ হিসাবে গণমাধ্যমে জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য জনগণের নজরে আনা হয়

দরকার, যাতে মানুষকে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবের তীব্রতা সম্পর্কে সচেতন করা যায়। গণমাধ্যম রিপোর্ট, আলোচনা, ফটোগ্রাফি এবং নিবন্ধ দ্বারা বিশেষজ্ঞদের মতামতের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে সহায়তা করে। সাধারণ মানুষ অনেক পরিবেশগত সমস্যার প্রভাব মূল্যায়ন করতে সক্ষম নাও হতে পারে। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে জনগণের চারপাশে অবিরত ওজোন স্তরের অবক্ষয়, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, মেরু অঞ্চলে বরফের টুকরো গলে যাওয়ায় পরিবেশের জন্য হুমকি এবং দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে, তা আলোচনা করা গণমাধ্যমের কাজ। আবার গণমাধ্যম জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত বিষয়ে জনসাধারণকে আলোকিত করতে একটি অনুঘটক হিসাবেও কাজ করে, তা হলো–গ্লোবাল ওয়ার্মিং, সবুজ শান্তি আন্দোলন, ওজোন স্তরের অবক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রভাব, অ্যাসিড বৃষ্টি প্রভৃতি (হার্টেল, বার্ক ও লোবেল, ২০১০)।

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ এবং গণমাধ্যমের করণীয়

সাম্প্রতিক দশকগুলোয় জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা এবং পরবর্তী সময়ে মিডিয়া কাভারেজের সমালোচনা করা হয়েছে। এটি এমন একটি বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয় যে, গণমাধ্যমকে রাজনৈতিক পক্ষপাত ছাড়াই বিষয়গুলোকে যেভাবে প্রতিবেদন করা হয় এর ওপর নজরদারি করা উচিত। সাম্প্রতিক গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাগুলো জনমতের মধ্যে যেভাবে তৈরি করা হয় তাতে গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট (সরকার, ২০২১)। জলবায়ু পরিবর্তন এমন একটি সমস্যা, যা ব্যাবসা থেকে রাজনীতি, খেলাধুলা এবং অবসর, সামাজিক চাপ, অভিবাসন প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করে তার গুরুত্ব প্রমাণ দিতে হয়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সমস্যাগুলোকে বোঝা বা আকর্ষক বিষয়বস্তু হিসাবে উপস্থাপনের দক্ষতার সব গণমাধ্যমের থাকে না বা একই স্তরের নয়। এক্ষেত্রে প্রথম বা প্রধান যে প্রশ্নটির সমাধান করা দরকার তা হলো, জনসাধারণ আসলে জলবায়ু পরিবর্তনে সংবাদে আগ্রহী কি না? এছাড়াও জলবাবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি প্রশ্নের উদ্রেক করে: জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা কী এবং তারা কতটা ক্ষমতার অধিকারী? এ সংবাদগুলোর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ জনসাধারণের কাছে কতটুকু প্ররোচিত এবং প্রভাবিত করতে পারে? সবকিছুর মধ্যে গণমাধ্যম জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ করতে কী কী পদক্ষেপ নেবে এবং কীভাবে এ বিষয়ে সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ করবে। নিম্নে এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের করণীয় কী, তা আলোচনা করা হলো।

প্রিন্ট বা মুদ্রণমাধ্যম

প্রিন্ট মিডিয়া বা মুদ্রণমাধ্যম সব প্রয়োজনীয় তথ্য প্রচার করতে ব্যবহার করা হয়। মুদ্রণমাধ্যমের সৌন্দর্য বা ব্যাবহারিক হলো, আপনি এর মাধ্যমে ঘটনায় ফিরে যেতে পারেন, উল্লেখ করতে পারেন, পড়তে পারেন, পর্যালোচনা করতে পারেন এবং অধ্যয়নও করতে পারেন। পরিবেশগত সমস্যার পাশাপাশি মানুষের ওপর জলবায়ু পরিবর্তন যে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে, বড়ো পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি করে এবং যা বর্তমান সময়ের তাদের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে বা ফেলে, সেসব তথ্য মানবতার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে নজরে আনা যায়। আর এ বিষয়গুলো সত্যিই উদ্‌বেগজনক। এর ওপর ফোকাস করা দরকার যাতে মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারে এবং সচেতন হতে পারে। মুদ্রণমাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক বিভিন্ন সভা সমাবেশ, আলোচনা অনুষ্ঠান, ফটোগ্রাফি এবং নিবন্ধ প্রচারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে সহায়তা করতে পারে।

প্রিন্ট মিডিয়া বা মুদ্রণমাধ্যম জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ প্রচার করার মাধ্যমে জনগণকে শিক্ষিত, সতর্ক, অবহিত এবং ক্ষমতায়ন করার পাশাপাশি এই বিপর্যয় থেকে নিজেদের রক্ষা করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারে। প্রত্যন্ত কমিউনিটিতে বসবাসকারী গণমাধ্যমের তথ্যপ্রাপ্তির বাইরে থাকা জনগণের কাছে পোস্টার এবং বইগুলোয় আরও বেশি জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ ইন্টারেক্টিভ এবং বিনোদনমূলকভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ করার জন্য রেডিয়ো এবং টেলিভিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর মাধ্যমে জনসাধারণকে সহজেই জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদের তথ্য প্রচার ও প্রকাশ করে সতর্ক ও সহায়তা করা যায়। সব পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, এনজিওকর্মী রেডিয়ো ও টেলিভিশন ব্যবহার করেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং পদ্ধতির মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে তাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা সম্ভব। টেলিভিশন ও রেডিয়োর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তুত এবং প্রতিরোধমূলক বার্তা প্রণয়ন ও প্রচার করা। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে এমন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও এনজিওগুলোর নিজস্ব অনুষ্ঠান কেবল টেলিভিশন, পাবলিক ব্রডকাস্টিং স্টেশন এবং স্যাটেলাইট টেলিভিশনে সম্প্রচার করে মানুষকে শিক্ষিত করা।

আন্তব্যক্তিক যোগাযোগমাধ্যম

যোগাযোগের সব চ্যানেলের মধ্যে আন্তব্যক্তিক যোগাযোগ সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য এবং ব্যক্তিগত মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত। জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ প্রকাশের জন্য অনেক ইন্টারপার্সোনাল চ্যানেলের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ বিষয়ে সতর্ক ও তথ্য দেওয়ার জন্য

গণসংহতি প্রয়োজন, সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন প্রয়োজন, সম্প্রদায়ভিত্তিক পন্থা ব্যবহার করে মুখোমুখি যোগাযোগ, জনপ্রতিনিধিদের মতামত এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ উপস্থাপনের কিছু মাধ্যম বা চ্যানেল রয়েছে। এগুলো হলো–ভাষা, শারীরিক ভাষা, আবেগ, এলাকার জনপ্রতিনিধিরা মিটিং এবং গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তথ্য দেন। আন্তব্যক্তিক যোগাযোগমাধ্যম জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। এগুলো তথ্যের উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায় এবং অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া ও কোনো ভুল ধারণার প্রতিকারের জন্য একটি সুযোগ দেয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনপ্রতিনিধি, উন্নয়ন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকরা অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের মধ্যে সাহায্য ও সহযোগিতা অর্জন করতে পারেন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে পিয়ার টু পিয়ার সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন্টারঅ্যাকশনের মাধ্যমে মানুষের আচরণ পরিবর্তন করা যায়।

লোকজ বা ফোক মিডিয়া

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ প্রকাশের একটি কার্যকরী মাধ্যম হলো ঐতিহ্যবাহী লোকজ বা ফোক মিডিয়া। এগুলোর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জনসাধারণকে বোঝার এবং জ্ঞানের স্তরকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। লোকজমাধ্যম ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব এবং এর মোকাবিলায় সম্ভাব্য প্রস্তুতির বার্তা ফলাও করে প্রচার ও প্রকাশ করা হয়। লোকজমাধ্যমে স্থানীয় ভাষা ও উপভাষা ব্যবহার করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে যাদের সাক্ষরতা কম, যোগাযোগের অন্যান্য ধরনে সীমিত এক্সপোজার; তাদের কাছে উপভাষা ও ভাষার ব্যবহারের পাশাপাশি অঙ্গভঙ্গি, সংগীত এবং ছন্দের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ তুলে ধরা। যদিও নতুন ধারার বা তরুণদের লোকজ মাধ্যমের বার্তা বুঝতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তদুপরি লোকজমাধ্যম বার্তা প্রেরক এবং গ্রহণকারীর মধ্যে সরাসরি ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। আর এভাবে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং পরিচিতি বার্তাগুলোকে খুব বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

হ্যাম বা অপেশাদার রেডিয়ো

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ প্রকাশ, বিভিন্ন সংকট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অপেশাদার রেডিয়ো যোগাযোগের একটি শক্তিশালী উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে যখন তারের লাইন, মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য প্রচলিত উপায়ে যোগাযোগ ব্যর্থ হয়, তখন অপেশাদার রেডিয়োর ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। এটির মাধ্যমে সেলুলার টেলিফোন সাইটগুলোর মতো 'চোক পয়েন্ট' ছাড়াই একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে তথ্য প্রচার ও প্রকাশ করা যেতে পারে। অপেশাদার রেডিয়ো অপারেটররা অ্যান্টেনার উন্নতিতে অভিজ্ঞ। শক্তির উৎস এবং বেশির ভাগ সরঞ্জাম আজ একটি অটোমোবাইল ব্যাটারি দ্বারা চালিত হয়, যা জনসাধারণের কাছে সহজেই তথ্য পৌঁছে দিতে পারে।

মোবাইল প্রযুক্তি

মোবাইল ফোন হলো মাল্টিমোডাল টুল পার এক্সিলেন্স। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ এসএমএস বা এমএমএস করতে পারে এবং গণসংহতি, কর্ম সতর্কতা, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রচার করতে পারে। বর্তমান স্মার্ট মোবাইল ফোনের ব্যবহারে এসএমএস ছাড়াও অন্যান্য বিষয়বস্তু জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক বার্তা তৈরি এবং প্রেরণের বর্ধিত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। নতুন প্রজন্মের মধ্যে উচ্চমানের ফটো এবং ভিডিয়ো ক্ষমতাসম্পন্ন স্মার্ট মোবাইল ফোনের কারণে অনেক সফটওয়্যার সরঞ্জাম রয়েছে, যা লোকের কাছে ফটো, অডিয়ো ও ভিডিয়োগুলো মবিলাইজেশন থেকে সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

ওয়েবভিত্তিক প্রযুক্তি

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদ বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছাতে এবং প্রশিক্ষণে ওয়েবভিত্তিক প্রযুক্তি কার্যকরী পরিকল্পনার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মানুষের ধারণা, জ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিনিময়ের জন্য একটি প্ল্যাটফরম হিসাবে এটিকে উপলব্ধি করা হয়। ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে এটি মানুষকে একত্রিত করে। জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সংবাদের বিভিন্ন ওয়েবের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ এতে প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে কোনো সময় বার্তা পৌঁছানো সম্ভব। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে প্রত্যেককে বিশ্বায়নের এই যুগে জাতীয় সীমানা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে সবার কাছে দ্রুত সহায়তা দেওয়া যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের অভ্যন্তরে এবং উপকূলীয় এলাকায় সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা, উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য দিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হলে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের ও গণমাধ্যমের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস সময়ের দাবি। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে মানুষকে সজাগ ও সচেতন করতে হবে। কলকারখানায় কালো ধোঁয়া নির্গমন কমিয়ে আনতে হবে। সিএফসি নির্গত হয়–এমন যন্ত্রপাতির ব্যবহার কমাতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে। বনভূমি ধ্বংস বন্ধ করতে হবে এবং বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন বাড়াতে হবে। সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির সন্ধান করতে হবে। প্রকৃতির ওপর মানুষের বিরূপ আচরণ বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দেশের সরকার ব্যাপক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা ফলাও করে গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

* *Carvalho, A; Burgess, J (December 2005). 'Cultural Circuits of Climate Change in UK Broadsheet Newspapers'. Risk Analysis.*
* *Newman, Todd P.; Nisbet, Erik C.; Nisbet, Matthew C. (26 September 2018). 'Climate change, cultural cognition, and media effects: Worldviews drive news selectivity, biased processing, and polarized attitudes' Public Understanding of Science.*
* *Schmidt, Andreas; Ivanova, Ana; Schafer, Mike S. (2013). 'Media attention for climate change around the world: A comparative analysis of newspaper coverage in 27 countries'. Global Environmental Change.*
* ইব্রাহিম ওজদেমির (২০২২) 'জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের করণীয়'
* ড. কবিরুল বাশার (২০২২) 'জলবায়ু পরিবর্তন: ঝুঁকি মোকাবিলায় আমরা কি সক্ষম?'
* মু. জাকির হোসেন খান, সিফাত ই রাব্বি (২০২০) 'জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে গ্রামীণ জনপদ'

লেখক: প্রভাষক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অধ্যয়ন বিভাগ
নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক প্রতিবেদনে করণীয়

পপি দেবী থাপা

কোনো বিষয়ে জনমত গঠন এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে গণমাধ্যম পালন করে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা। জনমানসে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি তা মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের এই ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সামনে এনেছে জাতিসংঘের Intergovernmental Panel of Experts on Climate Change (IPCC)। তাদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা, আমাদের এই গ্রহকে উত্তপ্ত করে তোলা গ্রিনহাউজ গ্যাসের নিঃসরণ কমিয়ে আনতে গণমাধ্যম রাখতে পারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। পাশাপাশি এটাও সত্য, গণমাধ্যমের যথাযথ দায়িত্ব পালনের অভাবে এর বিপরীতটাও ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এবং সাংবাদিকদের পালন করতে হবে দায়িত্বশীল, সময়োপযোগী ভূমিকা। যদিও গণমাধ্যমগুলো এখন জলবায়ুসংক্রান্ত রিপোর্টিং আগের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করছে, তেমনই বৃদ্ধি পেয়েছে এর সংখ্যাও। ৫৯টি দেশে আইপিসিসি পরিচালিত এক জরিপ বলছে, ২০১৬-২০১৭ সালে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংখ্যা ৪৭ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২০২১ সালে হয়েছে ৮৭ হাজার।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে–জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলো হয়ে উঠছে বিজ্ঞাননিষ্ঠ। অন্যদিকে এ বিষয়ে অবৈজ্ঞানিক, মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল তথ্য প্রদানকারী স্বার্থান্বেষীমহলগুলো গণমাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণে সমান সক্রিয়। গণমাধ্যমকর্মীরা কোনো ইস্যুতে চলমান বিতর্কে পক্ষ-বিপক্ষ অর্থাৎ দুপক্ষের বক্তব্যই উপস্থাপন করেন–এটাই সাধারণ রীতি। দেখা যায়, এ সুযোগে অনেক অবৈজ্ঞানিক তথ্যও সামনে চলে আসে, যা সাধারণের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি যখন এমন, তখন একজন গণমাধ্যমকর্মী

জলবায়ুবিষয়ক প্রতিবেদন ঠিক কীভাবে উপস্থাপন করবেন, তা নিয়ে ইউনেস্কো-আইপিসিসি বিশেষজ্ঞ প্যানেল পরিবেশ এবং জলবায়ুবিষয়ক সাংবাদিকতায় অন্যতম সম্মানিত নাম এন্ড্রু রেভকিনকে সঙ্গে নিয়ে ৫টি পরামর্শ উপস্থাপন করেছে। যার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক অনেক ভুল তথ্য, গুজবের প্রবাহ মোকাবিলার পাশাপাশি বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে গণমাধ্যম আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

অতি নাটকীয় কিছু থেকে বিরত থাকুন

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব যখন ক্রমান্বয়ে জেঁকে বসছে, সংগত করণেই জনগণ বিষয়টি সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চাইছে। পাশাপাশি এটাও বুঝতে চাইছে, সরকার এবং ব্যক্তি হিসাবে এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় তারা কী ভূমিকা রাখতে পারে। ইউনেস্কোর মতে, গণমাধ্যমের যে মূল ভূমিকা–জনগণকে অবহিতকরণ, জনস্বার্থের পাহারাদার এবং যে কোনো সামাজিক ইস্যুতে গঠনমূলক প্রচারণা–এই তিনটিই জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। রেভনিকের মতে, গণমাধ্যমকর্মীরা সাধারণত কোনো বিষয়ে নতুন কিছুর সন্ধানে থাকেন, ঠিক তেমনই সংবাদের উৎসও তাদের কাছে ভিন্ন গুরুত্ব বহন করে। উৎস হিসাবে জাতিসংঘ মহাসচিবের বক্তব্য আর একদল বিক্ষোভকারীর লন্ডনের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া এক কথা নয়। মি. রেভনিকের অভিজ্ঞতা বলছে, একজন পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক সাংবাদিক হিসাবে তার প্রকাশিত প্রথম প্রতিবেদনটির পর থেকে বিগত ৩৪ বছরে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া তো দূর বরং অবনতি হয়েছে। বর্তমানে গণমাধ্যমে একটি প্রবণতা খুব বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে যে তারা যেনতেনভাবে পাঠক, দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। এটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে হতে পারে; কিন্তু এর ফলে আমরা দেখছি, প্রতিবেদন হচ্ছে অতি নাটকীয়। অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের প্রতিবেদন হতাশার সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, প্রতিবেদনের ভাষা স্পষ্ট না হলে, বৈজ্ঞানিক শব্দগুলো বোধগম্য না হলে বা তাদের সহজবোধ্য ব্যাখ্যা সংযুক্ত না হলে পাঠকের কাছে সঠিক বার্তা পৌঁছায় না বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা ভ্রান্তধারণা দেয়। ইউনেস্কো এবং রয়টার্সের এক জরিপ বলছে, এ ধরনের প্রতিবেদনের ফলে কিছু মানুষ বিষয়টিতে আগ্রহ হারায়–স্রেফ মুখ ফিরিয়ে নেয়। চটকদার, নাটকীয় শিরোনাম সহজে পাঠক দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সঙ্গে নাটকীয় বর্ণনা যোগ করে আপনার হয়তো অনলাইনে ক্লিক অর্থাৎ পাঠক, দর্শক বাড়বে; কিন্তু বিষয়টি সাময়িক, আখেরে আপনার মূল উদ্দেশ্যসাধন হবে না। আপনাকে মনে রাখতে হবে, কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আপনি আপনার পাঠক এবং বিশেষজ্ঞ মতের সমন্বয় করছেন। আপনার যা বলার, নাটকীয়তা এড়িয়ে স্পষ্ট বলুন। বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো যথাযথ জেনে সহজ ভাষায়, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করুন। এভাবেই আপনি আপনার পাঠকের কাছে হয়ে উঠতে পারেন বিশ্বস্ত কণ্ঠ।

কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নয়, ভিন্ন গল্পগুলোও বলুন

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সাংবাদিকতা অর্থ এই নয় যে আপনি কেবল বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যা আর বৈজ্ঞানিক মত প্রচার করবেন। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক গল্প। আপনি হয়তো সকালের শুরুতেই ভাবছেন আগামী প্রতিবেদনে কেবল ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতা অথবা এবার চতুর্থবারের মতো উষ্ণতম বছর নিয়ে কিছু লিখবেন, যেটা সাংবাদিকরা সচরাচর করে থাকেন–সেটা ঠিক আছে; কিন্তু এটা কি শেষ পর্যন্ত ঝুঁকি হ্রাসের কোনো পথ দেখায়। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভেদে প্রতিবেদনের ধরন ভিন্ন হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ওহিওতে একজন মানুষের কাছে জলবায়ুবিষয়ক সর্বশেষ প্রবর্তিত আইন থেকে সে কী কী সুবিধা পেতে পারে, যা ঝুঁকি প্রশমনে সহযোগিতা করবে–এ তথ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ। তার জন্য সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার অথবা বিদ্যুৎচালিত গাড়ি ব্যবহারে কী সুবিধা রয়েছে, তা জানা জরুরি। এই ছোটো বিষয়গুলোই বড়ো পরিবর্তন আনবে। আবার উন্নয়নশীল দেশগুলোয় জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যার ঝুঁকির পাশাপাশি এটি মোকাবিলায় নতুন সম্ভাবনার কথা পাঠকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করতে পারে। হতে পারে সেটি বিকল্প বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের গল্প। মোট কথা, আপনার প্রতিবেদনের শিরোনামে 'জলবায়ু' শব্দটি থাকতেই হবে এমন নয় বরং ঝুঁকি মোকাবিলায় কার্যকর পথের কথা বলুন।

স্থানীয় সমস্যা এবং ন্যায়বিচারের কথা বলুন

আমাদের স্পষ্ট করে সাম্য এবং ন্যায়বিচারের কথা বলতে হবে। বিষয়টি সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। স্থানীয় বিষয়াবলি এবং সামাজিক উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করে সাংবাদিকরা হালের বহুল আলোচিত 'ক্লাইমেট জ্যাস্টিস' সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। এমন নয় যে বৈশ্বিয় উষ্ণায়নের জন্য বেশি দায়ী দেশগুলো বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছে। বরং ক্ষতির পরিমাণ কম দায়ী বা প্রায় দায়ী নয়–এমন দেশগুলোতেই বেশি। এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে ন্যায়বিচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ গেল একটি দিক, অন্যদিকে এ বছরে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে বন্যা ও ভূমিধসে ৪৫০ জনের মৃত্যু এবং ৪০ হাজার মানুষ গৃহহীন হওয়ার পর এক পর্যবেক্ষণে ভিন্ন একটি চিত্র উঠে এসেছে। মানুষগুলো শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ ক্ষতির স্বীকার হয়েছেন এমন নয়, এখানে জাতিগত বৈষম্য এবং দারিদ্রও একটি বড়ো কারণ। মানুষগুলোর এমন কোনো অর্থ বা ক্ষমতা ছিল না যে প্লাবন আসন্ন জানা সত্ত্বেও তা মোকাবিলা করার কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন। তারা এমন একটা অঞ্চলে বাস করতে বাধ্য হচ্ছিলেন, সামর্থ্য থাকলে যেখানে কেউ বাস করত না। এখানেই বহুল আলোচিত 'ক্লাইমেট জাস্টিস' বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। যেমন আপনার প্রতিবেদনে প্রাসঙ্গিক এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবনের বাস্তবতা। The World Weather Attribution Project থেকে পাকিস্তানে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতির নেপথ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা কতটা দায়ী, তা নিয়ে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। সেখানে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোয় সংগত কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কথা উঠে এসেছে, পাশাপাশি অন্যান্য কিছু বিষয়ও প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন: ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মানুষের বসবাস, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে সরকারি অব্যবস্থাপনা, এ সংক্রান্ত অবকাঠামো দূর্বলতা প্রভৃতি। একজন গণমাধ্যমকর্মী হিসাবে আপনাকে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোয় বসবাসকারী মানুষের অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে হবে।

বিশ্বস্ততা অর্জন করুন, যা কেবল প্রকৃত তথ্য দেওয়ার মাধ্যমেই সম্ভব

কোভিড-১৯ মহামারির শুরুতে আমরা দেখেছি অনির্ভরযোগ্য তথ্যের বন্যার মতো প্রবাহ, যা মোকাবিলায় কোভিড-১৯ ট্র্যাকার হয়ে ওঠে অন্যতম হাতিয়ার। এ রকম একটি ধারণা প্রাসঙ্গিক হতে পারে এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরিতেও। কোথাও টাইফুন, হারিকেন অথবা সাইক্লোন যাই আঘাত করুক, সেখানকার লোকসংখ্যা, তাদের সার্বিক অবস্থান এবং তা মোকাবিলায় কার্যকর প্রস্তুতির নির্ভরযোগ্য তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিবেদক হিসাবে আপনি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন

করতে পারবেন। দুর্যোগপরবর্তী কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ ক্ষয়ক্ষতি ও পুর্নগঠনের প্রকৃত ও নির্ভরযোগ্য চিত্র পরিবেশন করুন। মনে রাখতে হবে, আপনার দায়িত্ব কেবল নীতিনির্ধারক বা জনগণের জন্য একটি ঝড় কতটা শক্তিতে আঘাত করে, এই তথ্য পরিবেশন নয়, আপনাকে সামগ্রিক চিত্রটি পরিবেশন করতে হবে বিশ্বস্ততার সঙ্গে। মনে রাখবেন, দুর্যোগকে ঘিরে মিথ্যা তথ্য, গুজব ডালপালা মেলে। বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হলে ঘটনার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন, তথ্যের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হোন, যাচাই করুন, আপনার প্রতিবেদনে সরাসরি ভুক্তভোগী মানুষের কথা উপস্থাপন করুন। নিউইয়র্ক টাইমস এ কাজ করাকালীন মি. রেভনিক তার একটি উপলব্ধির কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে, জলবায়ু পরিবর্তন একটি জটিল এবং বহুমাত্রিক বিষয়, এখানে কোনো বিষয়কে সামনে আনতে প্রথম পাতার কাভার স্টোরির চাইতে একটি ব্লগও অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। মূল কথা, এখানে আপনি কেবল প্রতিবেদক নন, একজন সৈনিক–যে কেবল প্রকৃত চিত্র পরিবেশন করে না মিথ্যা কিংবা ভুল তথ্যের মূলে আঘাত করে সত্য তুলে আনে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে থাকুন এবং পথ দেখান

এটি আনন্দের যে ইদানীং জলবায়ুবিষয়ক প্রতিবেদনে প্রতিবেদকরা বিজ্ঞানীদের অনেক বেশি যুক্ত করছেন। নিশ্চিতভাবেই এটি আমাদের জন্য কল্যাণকর। মি. রেভনিক তার অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন, নিউজ রুমে বিজ্ঞানীদের আনাগোনা অনেক বেড়েছে, বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েই প্রতিবেদন প্রচার করছে সম্প্রচারমাধ্যম। সেটি কোভিড কিংবা ক্লাইমেট যে বিষয়ই হোক না কেন। অর্থাৎ বিজ্ঞাননির্ভর প্রতিবেদনের সংখ্যা বাড়ছে পৃথিবীজুড়ে। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি আরেকটি পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন–তার ভাষায়, আগে প্রতিবেদনগুলোর মর্মার্থ ছিল 'বন্ধ করুন' (যেমন দূষণ বন্ধ করতে হবে), সে ধারণায় পরিবর্তন এসেছে। এখন কেবল বন্ধ করুনেই সীমাবদ্ধ নয়, এখন পথ দেখায়, কী করতে হবে সেটাও বলে দেয়; অর্থাৎ 'শুরু করুন'। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত গল্পগুলো অনেককিছু নিয়েই হতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের প্রতিবেদন যেমন জীবন রক্ষা করতে পারে, ভূমিকা রাখতে পারে পরিকল্পনা প্রণয়নে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তনে এবং আগামী পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে জনগণকে প্রস্তুত করতে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমস্যাগুলোকে তুলে ধরে শক্তিশালী ধনী রাষ্ট্র, তাদের নাগরিক ও কোম্পানিগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সমস্যা।

লেখক: গবেষক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

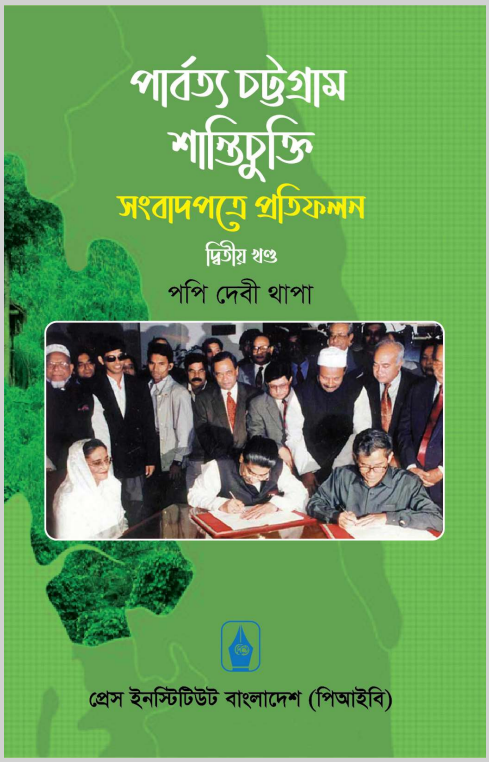

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

আমাদের উন্নয়ন ভাবনায় জল ও জলাভূমি

মোহাম্মদ এজাজ

জলাভূমি, নদী, খালবিল গুরুত্বপূর্ণ ইকোসিস্টেম হিসাবে কাজ করে, মানুষের জীবনেও এগুলোর অবদান অপরিসীম–অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জলবায়ু প্রশমন ও অভিযোজনে সাহায্য করে। বর্তমান সময়ের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের পরিকল্পনায় শহর তৈরি করতে গিয়ে নদী ও জলাভূমিকে তার ইকোসিস্টেম রেস্টরেশন বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা চিন্তায় না এনে কেবল ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা শিল্প ও নগর তৈরি করে একদিকে শহরগুলোকে শুধু দালানকোঠাসর্বস্ব নগরায়ণ করা হয়েছে। এ কারণে ঢাকার মতো শহর এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বসবাসের অযোগ্য শহরের একটি। গত ৪০ বছরে ঢাকার তাপমাত্রা প্রায় ১০ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর একটি প্রধান কারণ নিচু জমি ভরাট এবং পাইকারিভাবে ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলন। ঢাকার মতো চট্টগ্রাম শহর এখন সবুজ বেষ্টনী কমে গেছে। অন্য জেলা শহরগুলোয়ও জলাবদ্ধতা, দূষণ একটি বড়ো নাগরিক সমস্যা। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের ৩৩ শতাংশ রোগী পরিবেশ দূষণের কারণে অসুস্থ হচ্ছে ও মারা যাচ্ছে। বাংলাদেশের ভূমির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনভাগের দুইভাগ প্লাবনভূমি (নদী, জলাভূমি, খালবিল, হাওড়-বাঁওড় প্রভৃতি)। দেশের ৬৭ শতাংশ জমি বর্ষায় প্লাবনভূমিতে রূপান্তর হয় আবার শুষ্ক মৌসুমে এই ভূমিতেই দেশের ফসল আবাদ হয়। অপরিকল্পিত নগরায়ণের নামে নিচু জমি ভরাট করে তৈরি হচ্ছে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টারগুলো। ইকোলজি ও প্রাণবৈচিত্র্যের স্বাস্থ্য মাথায় না রেখে কেবল ভূমি ভরাট করে দেশের উন্নয়ন করতে গিয়ে উলটা আমাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে ব্যাহত হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সঙ্গে জল ও জলাভূমির সম্পর্ক

বাংলাদেশ SDG লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিতকরণের একটি স্বাক্ষরিত অংশীদার রাষ্ট্র। SDG লক্ষ্যমাত্রাগুলোর দিকে তাকালে বা পর্যালোচনা করলে আমরা আমাদের বর্তমান উন্নয়নের সঙ্গে

জল, জলাভূমি, পরিবেশের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার সরাসরি সম্পর্ক দেখতে পাই।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এক (১) দারিদ্র্য বিমোচন: জলাভূমি একটি পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য পানির উৎস, বিশেষ করে খরার সময়ে, গবাদি পশু, কৃষি এবং মানুষের ব্যবহারের জন্য। জলাভূমি উন্নত কৃষি উৎপাদন, পশু চারণ এবং মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়–এভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা দিয়ে থাকে। জলাভূমি সবচেয়ে দুর্বল ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জন্য সম্ভাব্য আয়ের ব্যবস্থা করে। পৃথিবীতে এক বিলিয়নের বেশি মানুষ সরাসরি নদী ও জলাভূমিগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে তাদের জীবিকানির্বাহ করছে। আমাদের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও জীবিকানির্বাহে মাঝি, জেলে, কৃষক, কৃষি উৎপাদন হাওড়-বাঁওড়, বিল-ঝিল ও নিচু জমির ওপর নির্ভরশীল। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য বিমোচনে নদী ও জলাভূমিগুলোর ভূমিকা রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা দুই (২) ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী: বর্ষার পরবর্তী সময়ে যে চাষাবাদ হয়, সেগুলোর অধিকাংশ হয় প্লাবনভূমিতে। এছাড়া চাষাবাদের সময় যে পানির প্রয়োজন, জলাভূমি তা সঞ্চিত করে রাখে। প্লাবনভূমিগুলোয় ধানসহ অন্যান্য শাকসবজির যে চাষাবাদ হয়, তা মানুষের খাবারের চাহিদা পূরণ করে। এছাড়া জলাভূমি স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য উৎপাদনশীল ও টেকসই মাছের প্রোটিনের উৎস হিসাবে কাজ করে। বলা যায়, জলাভূমি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য উৎপাদনের জন্য অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে পৃথিবীতে তৃতীয়। এছাড়াও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী দৈনন্দিন প্রোটিনের চাহিদা জলাভূমি, নদনদী, খালবিল থেকে বিনামূল্যে মৎস্য আহরণের মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

লক্ষ্যমাত্রা ছয় (৬) সবার জন্য নিরাপদ এবং টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ: জলাভূমি পানির প্রাকৃতিক পরিশোধক হিসাবে কাজ করে; জলাভূমিতে থাকা গাছপালা পরিশোধক পদার্থ, দূষিত পদার্থ, পলল শোষণ করে পানি পরিষ্কার রাখে এবং গুণাগুণ বৃদ্ধি করে। জীবনধারণের জন্য সুপেয় পানি অত্যাবশ্যক। পৃথিবীতে এক-তৃতীয়াংশ মানুষ সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশেও সুপেয় পানির প্রধান উৎস নদী, খাল, বিল। কিন্তু অপরিকল্পিত শিল্পায়নের কারণে নদী, খাল, বিল শিকার হয় দূষণের। যার কারণে শহরের অভ্যন্তরের মানুষের সুপেয় পানি সরবরাহ করতে গিয়ে রাষ্ট্র যন্ত্রকে শহর থেকে অনেক দূরে গিয়ে সুপেয় পানি খুঁজতে হচ্ছে। ঢাকার জনগোষ্ঠীর পানির সরবরাহ এখন মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র থেকে আনতে হয় কারণ ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর পানি এত দূষিত যে রাসায়নিক পদার্থ দিয়েও শোধন সম্ভব নয়। নদী ও জলাভূমিগুলো জীবিত না থাকলে মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকা কঠিন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা অসম্ভব।

লক্ষ্যমাত্রা আট (৮) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি: জলাভূমি মানুষকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে। জলাভূমিগুলো বর্ষার পানিতে পলি এসে উর্বর হয়। মানুষ তার খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য যে চাষাবাদ করে, তা জলাভূমিগুলো শুকিয়ে গেলে সেখানে করে। চাষাবাদ ও শিল্প উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পানির বেশির ভাগ জলাভূমি থেকে নেওয়া হয়। কিন্তু শিল্পোন্নয়ন করতে গিয়ে আবার একই নদীনালা, খালবিল দূষিত করা হচ্ছে। যার কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিল্প, খাদ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিরাপদ পানিপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তা এখনই দেখা দিচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে লক্ষ্যমাত্রা আট অর্জন প্রায় অসম্ভব।

লক্ষ্যমাত্রা এগারো (১১) টেকসই শহর এবং জনগোষ্ঠী: ঢাকার ধানমন্ডি লেক, হাতিরঝিল, ঢাকার আশপাশের নদীগুলো, এছাড়া ঢাকার মধ্যে ও আশপাশে জলাভূমি না থাকলে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা যেমন ধানমন্ডি, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, অন্যান্য এলাকায় বসবাস করা কঠিন হয়ে যেত। কারণ, এই নদী, জলাভূমিগুলো অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা রোধ এবং উজানের অববাহিকা থেকে আসা পানির ধারক ও পানি নেমে যেতে সাহায্য করে। অথচ মানুষ খালবিল, নদীনালা, জলাভূমিগুলোকে ভরাট করে শহর তৈরি করছে তাই ঢাকা টেকসই শহর না। ঢাকাকে টেকসই শহর করতে এবং টেকসই শহর গড়ার পরিকল্পনায় জলাভূমি, নদীনালা, খালবিল রক্ষা করতে হবে। কৃষিপ্রধান অঞ্চল থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি শহরে আসবেই। এটাই নগরায়ণের মূলতন্ত্র। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশের ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠী আগামী ৩০ বছরের মধ্যে শহরে বসবাস করবে। শহরের মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সুপেয় পানি, উৎপাদনের জন্যও পানি প্রয়োজন। ভূগর্ভ থেকে পানি উত্তোলন করে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে পানি সরবরাহ একটি অপরিকল্পিত সমাধান। সুতরাং এই নগরজীবন ও জনগোষ্ঠীর প্রাণ ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সুপেয় পানির উৎস নদী, খাল, বিল, জলাভূমি ভরাট করে উন্নয়ন করা হবে একটি আত্মঘাতী কাজ। কেবল নদী, জলাভূমিগুলোকে টিকিয়ে রাখলেই নগরজীবনযাপন সম্ভব হবে।

লক্ষ্যমাত্রা তেরো (১৩) জলবায়ু পরিবর্তন: মানুষ যে পরিমাণ হ্যাজার্ড তৈরি হয়, সেগুলো প্রশমিত করতে জলাভূমিগুলো সাহায্য করে। বর্ষাকালে যমুনা অববাহিকা বা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা এবং মেঘনা অববাহিকা থেকে যে পরিমাণ পানি বাংলাদেশে প্রবেশ করে জলাভূমি, খালবিল, নদীনদীর প্রস্থতা, নদীর স্রোত না থাকলে চারদিক পানিতে ডুবে তলিয়ে যেত। এক্ষেত্রে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে জলাভূমি, খালবিল, নদীনালা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সাম্প্রতিক সিলেটের বন্যা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে কেবল শহরগুলোয় বিনিয়োগ করে আর খাল-নদী ভরাট করে রাস্তা বানালে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উজানের পানি বাংলাদেশে প্রবেশ করে নদী, খালবিল দিয়ে বের হতে না পেরে আকস্মিক বন্যায় কী ক্ষতিসাধন করতে পারে।

লক্ষ্যমাত্রা চৌদ্দ (১৪) পানির মধ্যে জীবন: পৃথিবীতে যত প্রজাতির প্রাণ প্রভৃতি আছে এর ৪০ শতাংশ প্রজাতি নদী ও জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল। নদী ও জলাভূমির মূল মালিক হচ্ছে এসব প্রজাতি। এদের পরে দাবিদার হচ্ছে মানুষ এবং সেখান থেকে মানুষ সুবিধা ভোগ করে। জলাভূমিগুলো মাছসহ অন্যান্য প্রজাতির আশ্রয়স্থল, প্রতিপালন স্থল, ডিম ছাড়ার স্থল, বেড়ে ওঠার স্থল হিসাবে কাজ করে। বর্ষায় অনেক প্রজাতি ডিম ছাড়া ও আশ্রয় নেওয়ার জন্য নদীর মাধ্যমে খালবিলে প্রবেশ করে। জলাভূমি সেসব প্রজাতিকে আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের মৎস্যসম্পদ ও প্রাণবৈচিত্র্য সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাচ্ছে। পানির মধ্যে প্রাণবৈচিত্র্য ও মৎস্যসম্পদকে টিকিয়ে রাখতে হলে জলাভূমি, নদীনালা, খালবিল টিকিয়ে রাখতে হবে।

ভূবৈচিত্র্যগতভাবেই বাংলাদেশ সক্রিয় বদ্বীপ। বর্ষার সময় পানি চারদিকের ভূমি ডুবিয়ে জানান দেয় যে, এগুলো জলাভূমি, নদীনালা ও খালবিলের জায়গা যা মানুষ ভরাট করে দখল করেছে। শহর উন্নয়নের জন্য যেসব পরিকল্পনা করা হয় তাতে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে জলাভূমি, নদী, খালবিল সর্বোচ্চ পানিসীমার লাইনগুলোকে ঠিক রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হবে। বাংলাদেশে অল্পমাত্রায় বা অতিমাত্রায় বৃষ্টি হলে যে বন্যা হচ্ছে, এর কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত পানি নদীতে যাওয়ার যে রাস্তা বা খালগুলো ছিল, সেগুলো মানুষ ভরাট করে বন্ধ করে দিয়েছে। এতে মানুষ নিজের জন্য নিজেই বিপদ ডেকে আনছে। চাইলেই উন্নয়নের নামে যে কোনো জায়গা ভরাট করে শহর বা দালান নির্মাণ করলে সেটা আমাদের জন্যই ক্ষতিকর হবে। বাংলাদেশ সরকার

প্রতি ছয় মাসে বা এক বছরে স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে নদীর তথ্যসংবলিত কোনো অ্যাপ বা কোনো ডেটাবেজ তৈরি করতে হবে, যেখান থেকে নদীর পূর্ব ও বর্তমান অবস্থা জানা যাবে এবং সাধারণ লোকজন অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং সহজেই সমস্যাগুলো শনাক্ত করা যাবে

একশ বছর মেয়াদের বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ তৈরি করেছে। এ পরিকল্পনায় ৯টি জলাশয় রয়েছে। IUCN ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশকে যে ভাগ করেছে, সেখানে ২৫টি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যেতে চাইলে বদ্বীপ পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নদী ও জলাভূমিগুলোকে রক্ষা করতে হবে। নদী রক্ষার জন্য উন্নত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। যেসব নদী ও জলাশয় ভরাট হচ্ছে, দখল থেকে মুক্ত করা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে সর্বস্তরের সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে এবং সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশে প্রযুক্তিনির্ভর বা River Information System (নদীর তথ্য পদ্ধতি) উন্নত করা নেই, যেমন সীমানায় কতগুলো নদী আছে, নদীগুলোর পূর্ব ও বর্তমান অবস্থা। River Information System, Wetland Information System, Citzen Information System উন্নত করা সম্ভব হলে মানুষ, জলাশয়, প্রকৃতিকে একসাথে করা সম্ভব। প্রতি ছয় মাসে বা এক বছরে স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে নদীর তথ্যসংবলিত কোনো অ্যাপ বা কোনো ডেটাবেজ তৈরি করতে হবে, যেখান থেকে নদীর পূর্ব ও বর্তমান অবস্থা জানা যাবে এবং সাধারণ লোকজন অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং সহজেই সমস্যাগুলো শনাক্ত করা যাবে। তাহলে খুব সহজে সরকার নদী ও জলাভূমি রক্ষায় পদক্ষেপ নিতে পারবে এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হবে। একই সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

টেকসই উন্নয়নে প্রধান বাধা পানিদূষণ

জলাভূমি ও নদী স্বাদুপানির একটি বড়ো উৎস। শহরের প্রতিদিনের ব্যবহৃত পানি, চাষাবাদ ও শিল্পকারখানার উৎপাদনের পানি জলাভূমি ও নদী থেকে নেওয়া হয়। মানুষ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জলাশয় ও নদীর পানি দূষিত করছে। পানিদূষণের মাধ্যমে পানির নিরপিত্তা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

পানিদূষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ ছড়ায়। দূষিত পানিতে বিভিন্ন ক্ষতিকারক পদার্থ, রাসায়নিক পদার্থ, ভারী ধাতু (আর্সেনিক, লেড, মার্কারি, প্রভৃতি) থাকে। এ কারণে দূষিত পানি ব্যবহারে ক্যানসারসহ মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হতে পারে। দুর্বল গোষ্ঠী, বিশেষ করে গর্ভবতী মা, নবজাতক, পাঁচ বছরের নিচের শিশু বেশি ঝুঁকিতে থাকে। এতে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা খরচ বেড়ে যায়, তাদের কাজের সময় কমে যায় এবং দারিদ্র্য বাড়তে থাকবে।

চাষাবাদের সময় অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার, শিল্পকারখানার বর্জ্য প্রতিনিয়ত পানির সঙ্গে মিশে মাটি ও পানি দূষিত করছে। এতে মাটির উর্বরতা কমছে, দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে ফসল উৎপাদন ও শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, যা অর্থনৈতিক উন্নতিতে প্রভাব ফেলে। লিঙ্গসমতা করতে হলে প্রথমে নারীর মতপ্রকাশের অধিকার, স্বাস্থ্য, যৌন ও প্রজননের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কীটনাশক দ্বারা আক্রান্ত দূষিত পানি নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও হরমোনের সংবেদনশীল টিস্যুর ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া ব্রেস্ট ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। নারীর নিরাপদ স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদার করা সম্ভব নয়।

পানি ও স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে পারলে শিশুদের আরও উন্নত শিক্ষা প্রদান সম্ভব। দূষিত পানি পান করলে শিশুর ট্রাইকুরাসিসের মতো মারাত্মক ব্যাধি ও স্বাস্থ্যহানি ঘটবে, এতে শিক্ষা গ্রহণ ব্যাহত হবে। পানিদূষণের কারণে শহরের ক্লাস্টারগুলোর লোকজনের মধ্যে রোগ ছড়িয়ে পড়ে এতে নিরাপদ স্বাস্থ্যব্যবস্থা ব্যাহত হয়। শিল্প এলাকাগুলোয় অতিরিক্ত কার্বন নির্গত হওয়ার কারণে ফ্যাক্টরিতে কাজ করা লোকজন ও শিল্প-এলাকাগুলোয় বা আশপাশে বসবাসরত লোকজনের স্বাস্থ্যঝুঁকি বেশি থাকে। অতিরিক্ত কার্বন নির্গত হওয়ার কারণে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে উপকূলীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, মাঝি, জেলে, কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়াও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে দূষণ অধঃক্ষেপণ বেড়ে যায়, বৃষ্টির সঙ্গে কীটনাশক ছড়িয়ে পড়ে, অতিরিক্ত ঝড় ও বৃষ্টির মাধ্যমে দূষিত পদার্থ ছড়িয়ে পানিদূষণ বাড়িয়ে দেয়। বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনে পানিদূষণ বিস্তারলাভ করবে।

পানিদূষণের কারণে পানিতে বসবাসকারী প্রজাতিগুলোর জীবন হুমকির মুখে। প্রবাহের মাধ্যমে দূষণ ছড়িয়ে যাচ্ছে জলাশয় থেকে খালবিল, নদী, সমুদ্রে। সেখানে থাকা প্রাণীগুলোর টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। পানিদূষণ রোধ না করলে পানিতে থাকা প্রজাতি হারিয়ে যাবে। এছাড়া বর্ষার পানিতে দূষিত পানি মিশে চারদিকে ছড়িয়ে ভূমিকেও দূষিত করে। এতে ফসল উৎপাদনের জমি অনুর্বর হয়, মানুষের মাঝে পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে যায়, ভূমিতে থাকা গাছপালা, পশুপাখি মারা যায়।

জলাভূমি ও নদীর পানিদূষণ বর্তমানে একটি চ্যালেঞ্জ। পানিদূষণ শুধু মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য নয়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সামাজিক অগ্রগতির হুমকিস্বরূপ। পানিদূষণ রোধ করা না গেলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। পানিদূষণ রোধে প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে দূষণের উৎস ও কারণ। জমিতে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার রোধ করতে হবে, বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে, শিল্পকারখানার বর্জ্যের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে (প্রতিটি কারখানায় ট্রিটমন্টে প্ল্যান্ট থাকতে হবে), নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা করতে হবে, পরিকল্পিতভাবে নগর পরিকল্পনা, সর্বোপরি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পানিদূষণ রোধ করা সম্ভব। পানিদূষণ মোকাবিলায় সর্বস্তরের জনগণের উপস্থিতি, বিভিন্ন ছোটো-বড়ো প্রতিষ্ঠান, সরকারকে এগিয়ে এসে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তখনই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

পানিদূষণ, পরিশোধন ও উপাদানগুলোর গ্রহণযোগ্য মাত্রা

পৃথিবীর পৃষ্ঠে উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব ও তাদের প্রজাতি কালের বিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিকে রয়েছে। প্রাণবৈচিত্র্য প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু মানবসৃষ্ট দূষণের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং প্রাণের বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশের অবক্ষয় রোধে টেকসই উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। পৃথিবীর প্রাণবৈচিত্র্য টিকে থাকার জন্য পানির ওপর নির্ভরশীল। পানির সঙ্গে পলিথিন, প্লাস্টিক, শিল্পকারখানার বর্জ্য, গৃহস্থালির বর্জ্য, সলিড বর্জ্য, প্রাণিজ বর্জ্য, কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিষাক্ত কীটনাশক ও বিভিন্ন ধরনের সার মিশে পানিকে প্রতিনিয়ত দূষিত করছে। এতে পানি পান ও ব্যবহারের অযোগ্য হচ্ছে, প্রাণবৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

পানিদূষণের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর তিনভাগ পান উপযোগী পানির অবস্থা খারাপ। বিভিন্ন কারণে পানি যেভাবে দূষিত হচ্ছে, এ দূষিত অবস্থা থেকে পানিকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পরিণত করতে পারলেও অনেক বিবেচনার বিষয় ও প্রশ্ন থেকে যায়। যে পরিমাণ পানি আমরা দূষিত করছি, সেই পরিমাণ পানি কি আমরা বিশুদ্ধ করতে পারছি? পানি বিশুদ্ধ করতে পারলেও তা করতে যে ব্যয় হচ্ছে, সেই ব্যয় কি সবাই বহন করতে পারবে? ভবিষ্যতে কত দামে আমাদের পানি কিনতে হবে?

পানিদূষণের দায় ও বাস্তবতার জায়গা থেকে পানিকে দূষণমুক্ত করতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হলেও কিছু ত্রুটি থেকেই যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম ত্রুটি হচ্ছে শিল্পকারখানার বর্জ্য ও পানিকে ট্রিটমেন্ট না করা, ট্রিটমেন্টসংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বড়ো একটি অংশের অদক্ষতা এবং পানির উপাদান ও উপাদানগুলোর সঠিক মান সম্পর্কে ধারণা না থাকা। মানুষের গৃহস্থালির বর্জ্য, শিল্পকারখানার বর্জ্য, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, সলিড পদার্থ, কীটনাশক, সার পানিতে মিশে জলাশয়, নদী, খালবিল, হাওড়-বাঁওড়ের পানিকে দূষিত করছে। আবার মানুষ সে জলাশয় ও নদীর পানিকে বিভিন্নভাবে পরিশোধন করে ব্যবহার করছে। জলাশয় ও নদীর পানিকে বিভিন্ন ধাপে পরিশোধন ও ব্যবহার উপযোগী করা হয়।

প্রথমত, পানিতে থাকা বড়ো কণা ও পদার্থ যেমন: প্লাস্টিক বোতল, পলিথিন, কাগজ প্রভৃতি অপসারণ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, পানিকে কোয়াগুলেশন বা ফ্লোকুলেশন বেসিনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, যেখানে বিভিন্ন ধরনের কোয়াগুলেন্টস বা জমাট বাঁধা পদার্থ যেমন: অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত পলিডেডমার্ক যুক্ত থাকে। কোয়াগুলেশন বা ফ্লোকুলেশন বেসিনে পানি থেকে বিভিন্ন কণা, ময়লা, রং অপসারন করে পানিকে স্পষ্ট ও বর্ণহীন করে শোধন করা হয়।

তৃতীয়ত, পানিকে বর্ণহীন করার পর সেডিমেন্টেশন বেসিনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, যেখানে পানিতে থাকা অধঃক্ষেপ অপসারণ করা হয়।

চতুর্থত, পানি থেকে অধঃক্ষেপ অপসারণের পর পানিকে ফিল্টারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, যেখানে পানিতে থাকা অবশিষ্ট কণা, অধঃক্ষেপ অপসারণ করা হয়।

পঞ্চমত, ফিল্ট্রেশনের পর পানিকে ডিসইনফেকটেন্ট বেসিনে প্রবাহিত করা হয় ডিসইনফেকশন বা জীবাণুনাশক করার জন্য। পানিতে জীবাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ ক্লোরিন যুক্ত করা হয় যাতে পানিতে থাকা সম্ভব্য প্যাথোজেন বা অণুজীব যেমন: ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া যাদের মধ্যে রয়েছে ইসছেরিছিয়া কোলাই, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার, শিগেলা প্রভৃতি অপসারণ করে পানিকে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

সুস্থ জলজ জীবনের জন্য পানির স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটার কী?

পানিকে শুধু ট্রিটমেন্ট বা পরিশোধন করলেই ব্যবহার উপযোগী হয় না, পানির প্যারামিটারগুলোর মাত্রা ঠিক রাখতে হয়। বিশ্বে এবং বাংলাদেশে পানির উপাদানগুলোর একটি স্ট্যান্ডার্ড মান বজায় রেখে পানিকে পরিশোধনের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করা হয়। বর্জ্য পানির ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পানির প্যারামিটারের যে মান নির্দিষ্ট করেছে, বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর অনেক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে মিল রেখে পানির কিছু উপাদানের জন্য স্ট্যান্ডার্ড মান নির্ধারণ করেছে।

কোনো প্রাকৃতিক জলাধারে বর্জ্য পানি ট্রিটমেন্ট করে ছাড়তে হলে পানির প্যারামিটারগুলো যে স্ট্যান্ডার্ড মান রাখতে হয়, তা পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি, ১৯৯৭ অনুযায়ী উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক	প্যারামিটার নাম	স্ট্যান্ডার্ড লেভেল	ইউনিট	মন্তব্য
১	pH	6-9		pH পানির জারক প্রকৃতি নির্ধারণ করে। pH বাড়তে থাকলে পানির ক্ষারত্ব বাড়তে থাকে এবং কমতে থাকলে অম্লতা বাড়তে থাকে। pH-এর পরিবর্তন পানির অক্সিজেন ও তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করে।
২	Temperature	40	0_c	পানির তাপমাত্রা সব ধরনের বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। পানির তাপমাত্রার তীব্র পরিবর্তন জীবের জন্য প্রাণনাশক হতে পারে।
৩	DO (Dissolve Oxygen)	4.5-8	mg/lt	পানিতে কতটুকু অক্সিজেন দ্রবীভূত আছে তা বোঝায়। পানিতে তাপমাত্রা ও অণুজীবের অ্যাক্টিভিটি বৃদ্ধি পেলে অক্সিজেন দ্রবনীয়তা কমে যায়। এতে পানিতে থাকা জীবের অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয়।

ক্রমিক	প্যারামিটার নাম	স্ট্যান্ডার্ড লেভেল	ইউনিট	মন্তব্য
৪	TDS (Total Dissolve Solid)	2100	mg/lt	পানিতে দ্রবীভূত জৈব, অজৈব পদার্থ ও প্রায় সব লবণের উপস্থিতিকে বোঝায়।
৫	TSS (Total Suspended Solid)	150	mg/lt	পানিতে উপস্থিত সম্ভাব্য কণা বোঝায়, যা পানিতে দ্রবীভূত হয় না। ওয়েস্ট ওয়েটার ট্রিটমেন্টের পর যে কোনো ধরনের পানির গুণমান মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়।
৬	COD (Chemical Oxygen Demand)	200	mg/lt	পানিতে জৈব পদার্থের রাসায়নিক জারণ ঘটাতে প্রয়োজনীয় দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্দেশ করে। পানির পরিবেশগত স্বাস্থ্যের মূল সূচকের একটি সূচক। সাধারণত ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্টে ব্যবহৃত হয়।
৭	BOD (Biological Oxygen Demand)	50	mg/lt	পানিতে জৈব যৌগের জৈব-রাসায়নিক পচন এবং নির্দিষ্ট অজৈব পদার্থের অক্সিডেশনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্দেশ করে। পানির পরিবেশগত স্বাস্থ্যের মূল সূচকের একটি সূচক।

দেশের অধিকাংশ নদী ও জলাশয়ে বিভিন্ন বর্জ্যের ভারী ধাতু এসে পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করছে, যেগুলোর প্রভাব জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশে সরাসরি দেখা যায়। পানিতে উপস্থিত জীবের মধ্যেও ভারী ধাতুগুলোর উপস্থিতি লক্ষণীয়। পানিতে উপস্থিত কিছু ভারী ধাতুর স্ট্যান্ডার্ড মান উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক	ভারী ধাতুর নাম	স্ট্যান্ডার্ড লেভেল	ইউনিট	মন্তব্য
১	Mercury	0.01	mg/lt	পানিতে ভারী ধাতুর বিষক্রিয়া একটি উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত সমস্যা, যা উদ্ভিদ-প্রাণী বা মানুষ যেসব জীবের সংস্পর্শে আসে তাদের জন্য ক্ষতিকর পরিণতি রয়েছে। ভারী ধাতু ক্ষতিকারক পরিবেশ দূষণকারী, যা জীবের ওপর উচ্চ বিষাক্ত প্রভাব ফেলে। ভারী ধাতুগুলো পানিতে বা মাটিতে প্রবেশ করলে তা জমা হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে প্রবেশের (বর্তমানে সবজি ও মাছে পাওয়া যাচ্ছে) মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে। মানবদেহে ভারী ধাতুর উপস্থিতি বিভিন্ন অঙ্গ যেমন: স্নায়ুতন্ত্র এবং কিডনির ক্ষতি করতে পারে।
২	Chloride	600	mg/lt	
৩	Cupper	0.5	mg/lt	
৪	Chromium	0.1	mg/lt	
৫	Iron	2	mg/lt	
৬	Manganese	5	mg/lt	
৭	Lead	0.1	mg/lt	
৮	Zinc	5	mg/lt	
৯	Total Kjeldahl Nitrogen (as N)	100	mg/lt	
১০	Ammonia (as free ammonia)	5	mg/lt	

বর্জ্য পানি বা দূষিত পানিকে যখন ট্রিটমেন্ট করা হবে, তখন উপরিউক্ত প্যারামিটারগুলো ভালোভাবে চেক করা প্রয়োজন। এছাড়াও আনুষঙ্গিক আরও প্যারামিটার চেক করা প্রয়োজন। তবে এগুলো চেক করলে অন্যগুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। আন্তর্জাতিকভাবে যারা বাংলাদেশের পোশাক ক্রেতা রয়েছেন, তারা নিজস্ব কিছু এনভায়রনমেন্টাল পলিসি অনুসরণ করেন। জিরো ডিসচার্জ হ্যাজার্ডাস ক্যামিকেল (জেডডিএইচসি) ম্যানুফেকচারিং রেসট্রিকটেড সাব্সটেন্স লিস্ট অনুযায়ী যেসব প্যারামিটার রয়েছে, সেগুলোর প্রতিটি প্যারামিটারকে আরও সূক্ষ্মভাবে যাছাই করা হচ্ছে।

পৃথিবীব্যাপী পরিবেশকে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, বাংলাদেশ সেভাবে অগ্রসর হতে পারছে না। এখনো অনেক প্যারামিটারের মাত্রা আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন: ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্টের পর TSS-এর মাত্রা আন্তর্জাতিকভাবে রাখা হয়েছে 30 mg/lt, সেখানে বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা 150 mg/lt।

আন্তর্জাতিক এনভায়রনমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশকে এখন থেকেই বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি শিল্পকারখানায় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বাধ্যতামূলক করেতে হবে। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে দূষিত পানি ট্রিটমেন্টের পর পানির প্যারামিটারগুলোর আরও স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। ওয়েস্ট ওয়াটার জলাভূমিতে ছাড়ার আগে ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট করে প্যারামিটারগুলোর মাত্রা ভালোভাবে চেক করে ছাড়তে হবে। নির্দিষ্ট সময় পর পর কর্তৃপক্ষকে সরেজমিনে তদারকি করতে হবে। পানিদূষণ রোধ করতে পারলে নদী, জলাভূমি ও প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

শুধু পানির পরীক্ষা, প্যারামিটারগুলোর স্ট্যান্ডার্ড লেভেল নির্ধারণ করলেই হবে না, সেডিমেন্ট টেস্ট করাও প্রয়োজন। ওয়েস্ট ওয়াটার ছাড়া হলে নদী, জলাভূমির পানির সঙ্গে মিশে পানিকে দূষিত করছে ঠিক, তেমনইভাবে বর্জ্যে থাকা নিউট্রিয়েন্টস (যেমন: নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি), পলুউট্যান্টস, ভারী ধাতু সেডিমেন্টসে মিশে যায়। দূষণ রোধে আমাদের দেশে সেডিমেন্ট টেস্ট কম করা হলেও উন্নত দেশগুলোয় করা হয়।

লেখক: চেয়ারম্যান, রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার (RDRC)

পরিবেশ রক্ষায় ও দূষণের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে

মনোয়ার হোসেন

পরিবেশ বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি সূর্যালোক এবং পারিপার্শ্বিক জড়, অজড় সবকিছু মিলিয়ে বিরাজমান পরিস্থিতি বা অবস্থা। জন্ম, বেড়ে ওঠা, মৃত্যু–সবকিছুই পরিবেশ প্রভাবান্বিত। প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে একটা ব্যালেন্স বা স্থিতি বিরাজ করে। কোনো কারণে এই স্থিতি বা ব্যালেন্স যদি নষ্ট বা হালকা হয়ে যায়, তখন আমরা বলি পরিবেশের অধঃমান (degradation) হয়েছে। পরিবেশ অধঃমানের প্রভাব ব্যাপক এবং গভীর। অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, সমাজ তথা সার্বিকভাবে সবকিছুই হুমকির সম্মুখীন হয়, যা পরিণামে ধ্বংস-মৃত্যু ডেকে আনে। পৃথিবীতে অনেক নগর সভ্যতা, জাতিগোষ্ঠী পরিবেশ ধ্বংস বা পরিবর্তনের কারণে বিলীন হয়ে গেছে। পরিবেশ ধ্বংস বা পরিবর্তনের পেছনে মানুষের ভূমিকাই প্রধান।

জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে কিছু দেশের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক দিক থেকে উন্নত দেশগুলো, বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত হুমকির বিষয়ে সচেতন হয়েছে বেশ আগেই। এখানে উল্লেখ করা দরকার–বৈশ্বিক উষ্ণতা বা জলবায়ু পরিবর্তনের মূলে রয়েছে শিল্পোন্নত দেশগুলোর 'অবদান'। আজ গোটা বিশ্বই তাদের কারণে প্রকৃতি হুমকির মুখে পড়েছে। তবে তারা বুঝতে পেরেছে যে এই সমস্যার সমাধান করতে বা তীব্রতা কমাতে না পারলে বিশ্বই অস্তিত্বসংকটে পড়বে এবং সে অবস্থা থেকে তারাও মুক্ত থাকতে পারবে না। এ কারণে তারা বৈশ্বিক পরিবেশের মান উন্নত করতে না পারলেও অন্তত পরিবেশের অধিকতর ক্ষতি যেন না হয়, এজন্য বিভিন্ন ধরনের 'মিটিগেশন' পদক্ষেপ নিয়েছে এবং নিচ্ছে। একই সঙ্গে তারা পরিবেশের ব্যাপারে বিশ্ব সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে চলেছে। উল্লেখ করা দরকার, পরিবেশদূষণ বা degradation মানুষের দ্বারাই হচ্ছে। অজ্ঞতা, অপরিণামদর্শিতা ও লোভ–এ

তিনটি কারণেই পৃথিবীতে পরিবেশ ধ্বংস বা degradation হয়েছে এবং হচ্ছে। অবশ্য প্রাকৃতিক কারণেও পরিবেশ পরিবর্তিত হতে পারে। তবে প্রাকৃতিকভাবেই এ ক্ষতি কোনো না কোনোভাবে পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট ক্ষতি পূরণ হয় না।

মানুষের লোভ সংবরণ না হলে এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি না পেলে পরিবেশ degradation রোধ সম্ভব নয়। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইউরোপীয় বা বেশকিছু উন্নয়নশীল দেশ আগে থেকেই বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছে। সেসব দেশের সরকারগুলোও বিভিন্ন ধরনের নির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। ফলে সেসব দেশের সাধারণ মানুষ আগের তুলনায় অনেক সচেতন হয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় বাংলাদেশে পরিবেশ সচেতনতা এখনো গড়ে ওঠেনি। এর প্রধান কারণ–কাগজেকলমে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্বের কথা বলা হলেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ স্বল্প আর জনমত সৃষ্টির পদক্ষেপ স্বল্পতর। পরিবেশকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া দরকার, তা দেওয়া হচ্ছে না। শুধু ভাঁটা বন্ধ বা তা থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়, এ মন্তব্য পরিবেশবাদীসহ সচেতন মহলের।

গণমাধ্যম জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রধানতম হাতিয়ার। এই মাধ্যমকে সঠিকভাবে নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করলে ঈপ্সিত ফল দিয়ে থাকে–এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। জানামতে, আশির দশকের প্রথমদিকে ESCAP-এর সহযোগিতায় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) সাংবাদিকদের জন্য পরিবেশ বিষয়ে একটি উন্নতমানের কর্মশালার আয়োজন করেছিল। সাংবাদিকদের পরিবেশ বিষয়ে Sensitize করা, লেখনীর মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে সাংবাদিকরা যেন নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখতে পারে–এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। সপ্তাহব্যাপী কর্মশালায় পরিবেশসংক্রান্ত বিষয়ে গভীর জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে আরও অনেক কর্মশালা, সেমিনার হয়েছে। কিছুসংখ্যক এনজিও এবং সামাজিক সংগঠন নিজেদেরকে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে নিয়োজিত করেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, পরিবেশের ব্যাপারে কিছু সচেতনতা সৃষ্টি হলেও পরিবেশদূষণ বন্ধ হয়নি বা দূষণ কমিয়ে আনা যায়নি। সরকার আগের তুলনায় পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বের কথা অনবরত বলছে। দেশে প্রচুর বৃক্ষায়ণ হয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন আইন করা হয়েছে এবং সব উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার কথা বলা হচ্ছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর রয়েছে। এই অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড ঢাকা শহরে, যেখানে পরিবেশের মান সবচেয়ে নিচে চলে গিয়েছে। পরিবেশদূষণের অপরাধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা খুব দৃশ্যমান নয়। শহরে দূষণের প্রধান উপাদান গাড়ির হর্ন, মাইকের শব্দ, হোটেল-রেস্টুরেন্ট থেকে ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে নির্গত ধোঁয়া এবং আওয়াজ আর শীতাতপ যন্ত্রের গরম হাওয়া নিয়মিতভাবে নজরদারির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করার উদ্যোগ বা ব্যবস্থা কৃচিৎ দেখা যায়। অভিজাত এলাকা হিসাবে পরিচিত বনানী, গুলশান, ধানমন্ডি, উত্তরায় অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে যাতায়াত করলেই তা নজরে পড়ে। পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতি অভিযোগ–তারা নিজেরা স্বোদ্যোগে (Suo moto) দমনমূলক পদক্ষেপ নেয় না। দূষণের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ দায়ের করলে মাসের পর মাস ফেলে রাখা হয়। অধিদপ্তরের বক্তব্য, জনবলের অভাব রয়েছে। এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য কি না–প্রশ্ন থেকে যায়।

তবে আমাদের দেশের সে সংস্কৃতি, তাতে শক্তভাবে আইন প্রয়োগ না করলে পরিবেশ রক্ষার কার্যকলাপে আমরা পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় আরও পিছিয়ে থাকব, কোনো সন্দেহ নেই।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

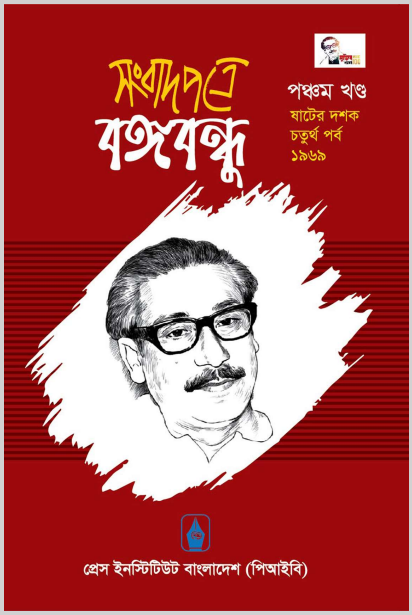

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

পরিবেশ ও উন্নয়ন সাংবাদিকতা

কামরুল ইসলাম চৌধুরী

উন্নয়ন আর পরিবেশের দ্বন্দ্ব চিরায়ত। চুম্বকের উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর মতোই যেন ধ্রুব সত্য। উন্নয়নের মাশুল গুনতে হয় প্রকৃতিকে, প্রাণবৈচিত্র্যকে, ইকো সিস্টেমকে, সর্বোপরি মানুষকে। আবার মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হটাতে, প্রাচুর্যের জোগান দিতেই প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ষাটের দশকে এসে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ চিন্তার জন্ম। পরিবেশবিজ্ঞানী আর অর্থনীতিবিদরা ভাবতে শুরু করেন কী করে উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পনায় পরিবেশ সংরক্ষণ চিন্তাকে একাকার করা যায়। বিশ্ব রাজনীতির পুতুলনাচের রূপক রাজারা বরাবরই সমৃদ্ধির যূপকাষ্ঠে প্রকৃতিকে বিসর্জন দিয়েছেন। গ্লোবাল ভিলেজ কনসেপ্টের বড়ো বাধাও হলেন তারা। তেমনই এক টালমাটাল স্নায়ুযুদ্ধকালে এলো পরিবেশ ও উন্নয়ন সাংবাদিকতা। আপন ঐতিহ্য সংরক্ষণ চিন্তা, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার এক নিরবধি প্রয়াস।

দাপদাহ উন্নয়নের অগ্নিস্রোতে আমার কৃষকের চিরচেনা বীজ যেন হারিয়ে না যায়। চিরসবুজ বৃক্ষরাজি যেন বিপণি পণ্য গাছ-কাঠ লুপ্ত না হয়। চিরস্বাদের মিঠাপানির চেনা চেনা মাছগুলো যেন উন্নয়নের রাক্ষুসে প্রজাতি গিলে ফেলতে না পারে। নদনদী-খালবিল-জলাভূমিতে দখলদারি যেন বন্ধ হয়। তেমনই এক টেকসই উন্নয়ন মতবাদ থেকেই পরিবেশ ও উন্নয়ন সাংবাদিকতার ভ্রূণ, জন্ম। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার হরণ না করে, প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে কীভাবে উন্নয়ন ঘটানো যায়, তেমনই চিন্তাধারাজাত সাংবাদিকতাই হলো পরিবেশ সাংবাদিকতার মূলকথা। পরিবেশ সাংবাদিকেরা উন্নয়ন নিয়ে যেমন ভাববেন, তাদের রিপোর্ট, ফিচার, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় লেখার সময় এবং ফটোগ্রাফে ঠিক তেমনই প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণের বিষয়টিও মাথায় রাখবেন। পরিবেশ সাংবাদিকতা, পরিবেশ আন্দোলন যেন নতুন বিশ্বের শান্তিরই এক বাতাবরণ।

পরিবেশ ও উন্নয়ন সাংবাদিকতার প্রসঙ্গ এলেই আমার চোখে ভেসে উঠে শ্রীলংকার প্রয়াত সাংবাদিক টারজি ভিটাচি, ভারতের চঞ্চল সরকার, বাংলাদেশের এবিএম মূসা, তোয়াব খান আর

আহমেদ নূরে আলমের অতি আপন চেনা চঞ্চল মুখগুলো। মনে পড়ে এসএম আলী, শেহাবউদ্দিন আহমেদ নাফা, বদিউল আলম, মোস্তফা কামাল মজুমদারের কথা। স্মৃতিপটে ভেসে উঠে ড. কাজী ফরহাদ জালাল আর ড. রেজাউল করিমের উৎসাহী উদ্যমী যতসব টেকসই উন্নয়ন আয়োজন। আমি বলছি আশির দশকের গোড়ার কথা। পরিবেশ ও উন্নয়ন সাংবাদিকতা তখন আমাদের এ অঞ্চলের দেশগুলোয় পল্লবিত সবুজের আচ্ছাদন মেলেছে মাত্র।

এদেশের পরিবেশ আন্দোলন, পরিবেশ মন্ত্রণালয় গঠন আর টেকসই উন্নয়ন সাংবাদিকতার বিকাশে বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের রয়েছে গৌরববোধ করার মতো অবদান।

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান দেড় দশক আগে ঢাকায় এসে বাংলাদেশের পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। কফি আনানের সেই হুঁশিয়ারির সঙ্গে বিজ্ঞানীরা একমত যে, বাংলাদেশ মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের কবলে। আবহাওয়া পরিবর্তনের নির্মম শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ। ভবিষ্যতে বিপর্যয় আরও ঘনীভূত হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা মাত্র এক মিটার বাড়লেই দেশের সাড়ে ১৭ ভাগ ভূমি সাগরতলে হারিয়ে যাবে চিরতরে। কয়েক কোটি লোক পরিবেশ আর জলবায়ু শরণার্থী হবে। বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন, তা সাগরকোলে তলিয়ে যাবে। বাংলাদেশের কৃষি, জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হবে। যে গরান বন বুক চিতিয়ে ঘূর্ণিঝড় আইলা, সিডর, নার্গিস, আম্পানের ছোবল থেকে উপকূলবাসীকে রক্ষা করেছিল। সুন্দরবন বিরল জীববৈচিত্র্যের এক বিরাট আধার। ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষার প্রাকৃতিক ঢাল। কার্বন শুষে নেওয়ার বড়ো প্রাকৃতিক যন্ত্র। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এক প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

মোট কথা হলো, বাংলাদেশের পরিবেশ সমস্যা আর সংকট এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এক আলোচিত বিষয়। আমাদের আর্সেনিক সমস্যা, ঢাকা মহানগরীর বায়ুদূষণের সংকট বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে যারা মাথা ঘামান, তাদের উৎকণ্ঠিত করে তোলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, এ দেশের পরিবেশ ভাগ্যবিধাতারা সে ব্যাপারে এখনো তেমন একটা উচ্চকণ্ঠ নন।

অথচ পরিবেশ খাতে বাংলাদেশের রয়েছে বেশকিছু সাফল্য। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেতৃত্বদানকারী বেশকিছু পরিবেশবিজ্ঞানী এবং পরিবেশবাদী রয়েছেন আমাদের। বিশ্বজুড়ে গর্ব করে বলার মতো আমাদের রয়েছে প্রথম পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা। তবু পরিবেশের সব মাপকাঠিতেই বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়া এক দেশ। পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতের নির্মম শিকারও। ১৮ কোটি মানুষের জনবহুল এ দেশের জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখোমুখি। হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ আচ্ছাদন। অবাধে উজাড় হচ্ছে বনরাজি। সুন্দরবন, মধুপুরের শালবন, পার্বত্য বন-বনানী আজ হুমকির সম্মুখীন। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, কর্ণফুলিসহ নদ-নদীগুলোয় চলছে নির্লজ্জ দখলদারি। পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, আর্সেনিক দূষণ, মাটিদূষণ আমাদের পরিবেশ-প্রতিবেশ সমস্যাকে জটিল করে তুলছে। নানা সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচি সত্ত্বেও আমাদের পরিবেশ অবক্ষয় ঘটে চলছে দ্রুতগতিতে। পরিবেশবিষয়ক আইন ও বিধিবিধানের ফাঁকফোকর এবং শিথিল প্রয়োগের সুযোগে চলছে নির্বিচারে এ ধ্বংসযজ্ঞ ও ক্রমাবনতি। বাংলাদেশ ব্যাপক জনসংখ্যার ছোটো এক দেশ। ১৯৭০ সালে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি। ২০৩০ সালের মধ্যে বেড়ে দাঁড়াবে ২৫ কোটিতে। অর্থাৎ প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে ২০০০ জন। শতাব্দী শেষে লোকসংখ্যা বর্তমানের চেয়ে প্রায় তিনগুণ হচ্ছে। আর এজন্য দেশটির প্রধান শঙ্কার কারণ হচ্ছে, টেকসই পরিবেশ বজায় রাখা যাবে কতটুকু? কার্যকর জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে তোলা আমাদের জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জ।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অথবা উপকূলীয় এলাকার আর্থসামাজিক জীবন, এর কৃষি ভিত্তি অথবা ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ডতা, বিশ্ব উষ্ণায়ন অথবা টর্নেডোর ভীতি যাই হোক না কেন, বাংলাদেশকে এর পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিবর্তনের এক বড়ো শিকারে পরিণত হতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা। এ তো আর অমূলক আশঙ্কা নয়। দেড় দশক আগে জাতিসংঘের মহাসচিব আনান বাংলাদেশ সফরকালে এ ব্যাপারে তার উদ্‌বেগ প্রকাশ করে গেছেন। পরবর্তী সব মহাসচিব সে আশঙ্কার কথা জানিয়ে হুঁশিয়ার করেছেন। কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত সম্ভাব্য ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে আমাদের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর আর বন বিভাগের অনেক কর্মকর্তাকে তেমন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে দেখা যায়নি।

অথচ আমাদের এখানে পরিবেশবাদীদের দাবিতেই পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (এফইজেবি)-সহ সংরক্ষণবাদীদের সেই শোরগোলের কারণেই পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়েছে ১৯৮৭ সালে। পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্ম ১৯৭৭ সালে। পরিবেশ আন্দোলনের ফলেই জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (নেমাপ) প্রণীত হয়েছে ১৯৯১-৯৫ সময়কালে। পরিবেশ মন্ত্রণালয়, এনজিও আর পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই অংশীদারত্বমূলক এই পরিবেশ পরিকল্পনা তৈরি করা হয় সাধারণ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে। তৃণমূলের মানুষ তাদের পরিবেশ ভাবনা এ কর্মপরিকল্পনায় তুলে ধরেন, সমাধানও বাতলে দেন। মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এডাব, এফইজেবি, সিইএনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরিবেশ কর্মপরিকল্পনা তৈরির কাজটি সম্পন্ন করে বিদেশি বিশেষজ্ঞ ছাড়াই। প্রণীত হয় পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫। তৈরি হয় পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ১৯৯৭। পরিবেশ আইন ও বিধি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এডাব, সিইএন, বেলা, এফইজেবিসহ নাগরিক সমাজ। নবীন মন্ত্রণালয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহযোগিতা, বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ও পরামর্শে পরিবেশ আইন ও বিধি প্রণয়নের মতো জটিল কাজ শুরু হয়। বাস্তবায়িত হয় ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো পরিবেশ কর্মসূচি টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি। নানা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মন্ত্রণালয় বেসরকারি প্রতিনিধিরা একযোগে কাজ করেন। পরিবেশকে ঘিরে রচিত হয় সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার এক অনন্য বন্ধন। নেমাপ অর্জন করে আন্তর্জাতিক প্রশংসা। সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার এই বন্ধন বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। ব্রাজিলে ৯২ সালে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কাজ করেন। ধরিত্রী সম্মেলন-উত্তরকালেও এ ইতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকে। ২০১২ সালে রিও+২০ সম্মেলনেও সবাই এক সুরে কথা বলেন। সিকি শতাব্দী আগে তৈরি করা নেমাপের অন্যতম প্রণেতা হিসাবে আমি মনে করি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে নেমাপ দলিলের হালনাগাদ করা এখন জরুরি প্রয়োজন।

বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের সদস্য আর গণমাধ্যমকর্মীদের ক্লান্তিহীন পরিশ্রমে পরিবেশবিষয়ক খবরাখবরের পরিমাণ এখন যথেষ্ট বেড়েছে। এদেশের সংবাদপত্র, রেডিয়ো-টেলিভিশনে ষাটের দশকে পরিবেশবিষয়ক সংবাদ ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। সত্তর ও আশির দশকে শূন্য থেকে ২০ কলাম ইঞ্চিতে তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। এখন প্রতিদিন ২৫০ থেকে ৩০০ কলাম ইঞ্চি পরিবেশবিষয়ক রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, ফিচার, আলোকচিত্র দৈনিক কাগজে প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে। নিয়মিত পরিবেশবিষয়ক পাতাও প্রতি সপ্তাহে বের হচ্ছে কয়েকটি কাগজে।

টেলিভিশনে ষাট ও সত্তর দশকে নিয়মিত কোনো পরিবেশবিষয়ক সংবাদ পাওয়া যেত না। এখন বিটিভিতে প্রতিদিন গড়ে এক থেকে দশ মিনিট পরিবেশ বিষয়ক খবরাখবর ও অনুষ্ঠান থাকছে। অন্যান্য বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো এবং রেডিয়োতেও একইভাবে পরিবেশ বিষয় থাকছে। মোট কথা, গুণগত মান যাই হোক না কেন, পরিমাণগত দিক থেকে পরিবেশবিষয়ক লেখালেখি আর খবরাখবর গত কয়েক দশকে ধীরে ধীরে বেড়েছে। তবে গত কয়েক বছরে পরিবেশ সাংবাদিকদের কল্যাণে তা বেড়েছে অতি দ্রুতগতিতে। গণমাধ্যমের এই ইতিবাচক ও সক্রিয় ভূমিকার ফলে বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ সামগ্রিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। এমনকি ওসমানী উদ্যান পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে। বাংলাদেশের পরিবেশ সমস্যা বিশ্ব পর্যায়ে উঠে এসেছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি, সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার হাত তেমন একটা বাড়িয়ে দেয়নি বিশ্ব সম্প্রদায়।

বারবার তাই কানে ভেসে আসছে জাতিসংঘ পরিবেশ সংস্থার তদানীন্তন নির্বাহী পরিচালক ক্লাউস ট্রপারের কথা–'বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ক্লাসিক কেস'। সত্তর দশকে ক্লাউস ছিলেন জার্মান পরিবেশমন্ত্রী। রাইন নদী তখন মারাত্মক দূষিত। তিনি ঝাঁপ দিলেন রাইনে। সাঁতার কাটলেন। ইউরোপের নানা দেশে পরিবেশ জলবায়ু সম্মেলন সেমিনারে যোগ দিতে গিয়ে দেখি, সেই রাইন নদী এখন দূষণমুক্ত। মার্গারেট থ্যাচার দূষিত টেমসকে রক্ষার জন্য তার নির্বাচনি ইশতাহারে 'টেমস বাঁচাও' শিরোনামে কর্মসূচি রেখেছিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি সত্যি সত্যি টেমস নদীকে বাঁচিয়েছিলেন। আজ টেমসের বুকে ঢেউ খেলে যায়। অথচ আমাদের বুড়িগঙ্গার জন্য অনেকের মন গলে না। ঢাকার বায়ুতে সিসার পরিমাণ নিয়েও তেমন টনক নড়ে না। আর্সেনিক দূষণে গ্রাম-গ্রামান্তরের কোটি হতদরিদ্র মানুষ আক্রান্ত। নীতিনির্ধারকদের অনেকের সে ব্যাপারে নেই কোন মাথাব্যথা। সত্যি এ যেন এক নির্লজ্জ ক্ষমাহীন ক্ল্যাসিক কেস। কফি আনানের কথা বোঝার মতো লোকের বড়ো অভাব এ দেশে। যেমন অভাব কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর (প্রয়াত পরিবেশবাদী ওবায়দুল্লাহ খান) কবিতার সুরেলা ধ্বনি মরমি সুর উদ্ধারকারীর। বাংলাদেশের মাটি, নিসর্গ, প্রকৃতি, শস্য-শ্যামল প্রান্তরের প্রতি অসীম মমত্ববোধসম্পন্ন এমন উচ্চমানের পরিবেশবাদী কবির জন্ম এ দেশে আর হবে কি না সন্দেহ!

পাশের দেশ ভারতে পরিবেশ আইনের কঠোর প্রয়োগ হচ্ছে। ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট এ ব্যাপারে পালন করছে অগ্রণী ভূমিকা। আমাদের সুপ্রিমকোর্ট সে তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এ আমাদের আরেক ব্যর্থতা। দেশের বিদ্যমান পরিবেশ আইনগুলোর সুষ্ঠু প্রয়োগ হলে জাতির টেকসই উন্নয়নযাত্রা এগিয়ে যেত অনেকদূর। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ, সমন্বয় আর পারস্পরিক সহযোগিতা পরিবেশ সংরক্ষণে আজ অপরিহার্য।

দুই দশক আগে সরকার ঢাকা মহানগরী থেকে টু স্ট্রোক থ্রি হুইলার বেবি ট্র্যাক্সি আর দেশব্যাপী পলিথিন নিষিদ্ধ করায় দেশবাসী পরিবেশগত সুফল ভোগ করতে শুরু করেছিল। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল যৎসামান্য। আমাদের রাজনীতিকদের মনে রাখা উচিত, চীনের মতো ১৩৫ কোটি মানুষের দেশও আজ পরিবেশ আন্দোলনের সম্মুখ কাতারে থাকতে আগ্রহী। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে সবুজ জাতীয় আয় গণনার আর সবুজ উন্নয়ন নীতি কৌশল অনুমোদন তারই প্রমাণ। আরও প্রমাণ চান। কেন, দেখতে পাননি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কেনিয়ার বিপ্লবী পরিবেশবাদী ওনানদা মাথাই। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য নোবেলও পেয়েছেন মার্কিন সাবেক উপরাষ্ট্রপতি আল গোর ও আইপিসিসি।

২০০৮ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) আমরা তৈরি করি। ২০০৯ সালে তা সংশোধিত হয়। বাংলাদেশ প্রথম দেশ যে এটি করেছে। ১৩ বছর পর এখন এটি জন-অংশগ্রহণের ভিত্তিতে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এ দলিলের অন্যতম প্রণেতা হিসাবে এটি আমার দাবি। তাহলে ২০২৩ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনার একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন দেখতে পাবে। এটির মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাড়ানো প্রয়োজন। সব জাতীয় পরিকল্পনার মূলধারায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার ওপর জোর দিতে হবে। এতে বাংলাদেশকে জলবায়ুসহিষ্ণু দেশে পরিণত করার জন্য রূপান্তরমূলক অভিযোজন অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এসডিজিগুলোর সঙ্গে ডেল্টা প্ল্যান এবং দেশের অষ্টম ও নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনকে সংযুক্ত করে সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন করা দরকার। বদ্বীপ পরিকল্পনাটিকেও জনমতের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

> ইউরোপের নানা দেশে পরিবেশ জলবায়ু সম্মেলন সেমিনারে যোগ দিতে গিয়ে দেখি, সেই রাইন নদী এখন দূষণমুক্ত। মার্গারেট থ্যাচার দূষিত টেমসকে রক্ষার জন্য তার নির্বাচনি ইশতাহারে 'টেমস বাঁচাও' শিরোনামে কর্মসূচি রেখেছিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি সত্যি সত্যি টেমস নদীকে বাঁচিয়েছিলেন

আজ আমাদের স্লোগান হোক–হটাও দূষণ, বাঁচাও মানুষ। ক্লাউস, মাথাই, কফি আনানের মতো হাজারো পরিবেশবাদীর জন্ম হোক আমার দেশে। আমরা সবুজ বাংলাদেশের সন্ধানে–এটাই হোক সবার একান্ত কামনা। তাহলেই হয়তো ধরিত্রীর কাছে আমাদের অনেক ঋণের খানিকটা শোধ হবে। পাখ-পাখালির কলকাকলি মুখরিত সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশের নদীর ঢেউ, কৃষকের ধানের শিসে ভোরের শিশির ফোঁটার অনিন্দকান্তি, পল্লিবধূদের বীজ তুলে রাখার প্রাণান্তকর প্রয়াস, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গর্জন, চঞ্চল হরিণ শাবকের প্রকৃতির কোলে নিঃশঙ্ক ছুটে চলা, রাখালের বাঁশির সুরেলা সুমধুর ধ্বনিতে পরিবেশ সংরক্ষণে উজ্জীবিত হোক আমাদের এ দেশ। সবুজ উন্নয়নের পথে টেকসই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শরিক হই।

লেখক: বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের চেয়ারম্যান এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক

বিকশিত হোক পরিবেশ সাংবাদিকতা

ড. হারুন রশীদ

করোনা মহামারিকালে সবকিছু অচল হয়ে পড়ে। ভাইরাসটি ছোঁয়াচে হওয়ায় নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। ফলে লকডাউন, শাটডাউনের মতো সিদ্ধান্তে যেতে হয় কোনো কোনো অঞ্চল বা দেশকে। বন্ধ হয় গাড়িঘোড়া। এমনকি বিমান চলাচলও। কোনো কোনো দেশ সীমান্তও সিলগালা করে দেয়। যাতে ভাইরাসজনিত রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

মহামারিতে ব্যাপক প্রাণহানি হয়েছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। অর্থনীতির ওপর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু এরপরও নতুন একটি অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে মানুষজন। সেটি হচ্ছে প্রকৃতির আবার নতুন করে প্রাণ ফিরে পাওয়া। এ দুই-তিন বছরে মানুষের সর্বগ্রাসী অত্যাচার থেকে অনেকটাই রক্ষা পেয়েছে প্রকৃতি। জনবহুল পর্যটন স্পটগুলো জনশূন্য হওয়ায় সেখানকার পশুপাখি নিরাপদে ঘুরে বেড়িয়েছে। কলকারখানা বন্ধ থাকায় দূষণ কমেছে। কমেছে কার্বন নিঃসরণ। শুধু চীনেই ২০ শতাংশ গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছে ১০ শতাংশ। ফলে জলবায়ু বিশুদ্ধ হয়েছে। প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে পেরেছে মানুষ। ধুলায় ধূসর ঢাকা, দিল্লি ও বেইজিংয়ের আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। স্বচ্ছ পানিতে ডলফিনের ঘোরাফেরা দেখা গেছে।

করোনার সময়ে মানুষ সবচেয়ে ভুগেছে অক্সিজেন সংকটে। মানুষের চলাচল সীমিত হয়ে পড়ায় গাছ কাটাও কমে যায়। ফলে প্রকৃতিতে বেড়ে যায় অক্সিজেনের সরবরাহ। পৃথিবী ভরে যায় সবুজে। কোভিড-১৯-এর অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃতির ওপর অত্যাচার বন্ধ করে তার কাছে ফিরে যাওয়া। সহাবস্থান না করে অত্যাচার চালালে মানুষও যে টিকতে পারবে না, এটিই যেন বলে দিচ্ছে করোনা মহামারি। এ কারণে পরিবেশ রক্ষা এবং সচেতনতার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। বিশেষ করে পরিবেশবিষয়ক সাংবাদিকতার বিষয়টি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আমাদের সমাজ রাজনীতি প্রভাবিত। রাজনীতি, অর্থনীতি, অপরাধের মতো বিষয় সাংবাদিকতায়

যতটা গুরুত্ব পায়, পরিবেশ সাংবাদিকতা ততটা পায় না। অথচ আমাদের অস্তিত্বের স্বার্থেই পরিবেশ সাংবাদিকতার বিকাশ অত্যন্ত জরুরি।

প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে মানুষ তথা প্রাণিকুলের সঙ্গে সহাবস্থান করে কীভাবে একসঙ্গে চলে পরিবেশের আরও উন্নয়ন ঘটানো যায়, সেটিই পরিবেশ সাংবাদিকতার মূল কথা। রিপোর্ট, ফিচার, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, এমনকি ফটোগ্রাফিতেও পরিবেশ সংরক্ষণের ভারসাম্যের বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। পরিবেশ সাংবাদিকতা পরিবেশ আন্দোলনেরই শান্তিময় এক বাতাবরণ যেন।

বাংলাদেশে নদী-খালগুলোর দখল-দূষণ বন্ধ না হওয়ায় পরিবেশের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। দখল-দূষণের বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যে কিছু অভিযান এবং সামান্য জেলজরিমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে সবকিছু। অথচ পরিবেশ সচেতনতার এই যুগে নদী-খালের দখল-দূষণ বন্ধ এবং যথাযথভাবে তা রক্ষা করা সময়ের দাবি।

ডাইং বর্জ্য তুরাগ নদীতে ফেলে দূষণের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। জরিমানাও করা হয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে। কিন্তু দূষণ বন্ধ হয় না। এসব বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে ক্ষতিকর প্লাস্টিক, পলিথিন, রাসায়নিক সামগ্রী, জৈব-অজৈব ও গৃহস্থালি বর্জ্য। শুধু তাই নয়, সাভার অঞ্চলের শিল্পকারখানার রাসায়নিক বর্জ্যও ফেলা হচ্ছে নদী-খালে। গাজীপুরের অবস্থাও একই। সেখানকার জমিজমা পর্যন্ত চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে শিল্পবর্জ্যের দূষণে। এ অবস্থায় এতদঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে নানা রোগব্যাধি। শিল্পকারখানা এবং প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মেনে চলে, এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নদী-খাল দখল-দূষণ দেশে নতুন কোনো ঘটনা নয়। 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে যে যেভাবে পারে এই দখলদারি চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনও এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় নির্বিকার ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দখলদাররা এতটা প্রভাবশালী যে, তারা আইন-প্রশাসন সবকিছুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়। অথচ নদনদীর টিকে থাকার সঙ্গে বলা যায় বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক অস্তিত্বের সম্পর্ক জড়িত। কাজেই যে কোনো মূল্যে নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

নদী থেকে বালু উত্তোলন করার কারণেও নদীর অস্তিত্ব বিলীন হচ্ছে। আশার কথা হচ্ছে, নদীর মধ্যে বালুমহাল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। সেই জায়গা ব্যতীত অন্য কোনো জায়গা থেকে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এক বছরের বেশি বালুমহাল ইজারা দেওয়া যাবে না। ক্ষেত্রবিশেষে এই সময়সীমা আরও কম হতে পারে। রাতে বালু উত্তোলন সম্পূর্ণ বন্ধ।

ইতঃপূর্বে ঢাকার চারপাশের নদী বাঁচানোর জন্য হাইকোর্টকে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। কিন্তু দখল বন্ধ হচ্ছে না। একদিকে উচ্ছেদ অভিযান চলে, অন্যদিকে নতুন করে দখল হয়। এই সাপলুডু খেলায় শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় দখলকারীরাই। অথচ নদী দখল বন্ধ করতে না পারলে এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। পরিবেশ সচেতনতার এ যুগে নদীর অপমৃত্যু হবে আর সবাই চেয়ে চেয়ে দেখবে, এটা হতে পারে না। দখলদারদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছাড়া নদী দখল বন্ধ করা যাবে না। নদী দখলে একটি দুষ্টচক্র অত্যন্ত ক্রিয়াশীল—এ চক্র ভাঙতে হবে। প্রশাসনের কোনো গাফিলতি থাকলে সে ব্যাপারেও ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা সুজলা-সুফলা, শস্যশ্যামলা নদীমাতৃক বাংলাদেশকে তার আপন মহিমায় দেখতে চাই।

দিন পালটেছে। কৃষিতে যুক্ত হয়েছে নতুন প্রযুক্তি। নতুন নতুন উদ্ভাবন আমাদের কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে দিচ্ছে কয়েকগুণ। সারা বছরই পাওয়া যাচ্ছে সব ধরনের সবজি, ফসল। মাছ-মাংস উৎপাদনেও ঘটেছে বিপ্লব। বিশেষ করে মৎস্যচাষ বদলে দিয়েছে চাষিদের ভাগ্য। এমনও বলা হচ্ছে—মাছই বদলে দেবে বাংলাদেশকে। মাছ উৎপাদনে বিপ্লব ঘটেছে। দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে এখন তা রপ্তানিও হচ্ছে। অ্যাকুরিয়ামের রঙিন মাছ চড়া দামে কিনে আনতে হতো সিঙ্গাপুর থেকে। এখন তা দেশেই উৎপাদন হচ্ছে।

মাছচাষের বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও নানা প্রতিকূলতায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাচ্ছে না। মাছচাষে তো জল বা জলাশয়ের দরকার। জলই যদি না থাকে, তাহলে মাছ থাকবে কেমন করে? জলের আধার হচ্ছে নদীনালা-খালবিল। দেশের নদনদীগুলো দখল-দূষণে হারিয়ে যাওয়ায় প্রাকৃতিকভাবে মাছের উৎপাদন অনেক কমে গেছে। দেশে এখন মাছ উৎপাদনে একটি বিপ্লব ঘটেছে। বাণিজ্যিকভাবে অনেকে লাভবান হচ্ছেন। মাছের উৎপাদন বেড়েছে বটে; কিন্তু তাতে পুষ্টি চাহিদা মিটছে না। এজন্য দেশীয় মাছের উৎপাদন বাড়ানোর প্রতি আমাদের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। প্রাকৃতিকভাবেই যেন দেশি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। মূলত মাছে-ভাতে বাঙালিকে প্রাকৃতিক মাছের অতুলনীয় স্বাদ ফিরিয়ে দিতে হলে দেশের নদীনালা-খালবিলগুলো বাঁচাতে হবে সবার আগে।

এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, দেশে ৫৪ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ বিলুপ্তপ্রায়, ২৮ প্রজাতির মাছ চরম বিপন্ন এবং ১৪ প্রজাতির মাছ সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে। এর প্রধান কারণ বাংলাদেশ এখন প্রায় খালবিল-নদীনালাশূন্য। খালবিল ভরাট করে চলছে নানা স্থাপনা তৈরির মহোৎসব। যেসব নদী অবশিষ্ট রয়েছে, সেগুলোয় দূষণের মাত্রা এত বেশি, মাছের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন। বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর অবস্থা আরও সঙ্গীন। হাজারীবাগের ট্যানারি শিল্প সাভারে স্থানান্তরের পর বুড়িগঙ্গা তার রূপ ফিরে পাচ্ছে, এটা আশার কথা। একইভাবে অন্য নদনদীগুলোও দূষণ থেকে রক্ষা করতে হবে।

পৃথিবীর আশ্চর্যতম এক নদীর নাম হালদা। চট্টগ্রামের ব্যতিক্রমী এই নদীতেই পূর্ণিমা-অমাবস্যার একটি বিশেষ সময়ে মাছ ডিম ছাড়ে। বহুসংখ্যক মানুষের জীবন-জীবিকানির্বাহ হয় এই নদীকে কেন্দ্র করেই। নদীর পানিও ভূ-উপরিস্থ জলের আধার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শহরে এই নদী থেকেই পানি শোধন করে তা পানের জন্য সরবরাহ করা হয়। অথচ দখল-দূষণে এই নদীও মৃতপ্রায়। হালদা দখল করে হচ্ছে ভাঁটা, বসতবাড়ি।

এটা এক আত্মঘাতী প্রবণতা। যেখান থেকে শত শত মন মাছের ডিম উৎপাদন হয়, সেখানে এখন এক মন ডিম পাওয়াও দুষ্কর। ফলে মাছের অভাব যেমন দেখা দিচ্ছে, তেমনই নদী-তীরবর্তী বহুসংখ্যক মানুষ তাদের জীবিকা হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এটা মনে রাখা দরকার, হালদা নদী বাঁচলেই প্রাকৃতিক মাছের বিশাল এক ভান্ডার রক্ষা পাবে। হালদা একটি বিশেষ ধরনের নদী; একে রক্ষা করতে হবে যে কোনো মূল্যে। সুন্দরবন যেমন অনন্য, আমাদের দেশকে পৃথিবীর বুকে তুলে ধরছে এর রূপ-রস-গন্ধ দিয়ে, তেমনই হালদাও। একটি সুন্দরবন যেমন কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, তেমনই হালদাও। এই বিশিষ্টতার মূল্য দিতে জানতে হবে।

কৃষিজমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে তা বৃষ্টির পানি বা সেচের মাধ্যমে বিল ও জলাশয়গুলোয় গিয়ে পড়ে এবং মাছের বেঁচে থাকার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানা কারণে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে দেশীয় প্রজাতির মাছ। বর্তমানে মৎস্যচাষিরা এমন প্রজাতির মাছচাষ করছেন, যেগুলো অতি অল্প সময়ে দ্রুত বর্ধনশীল। শুধু বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক এসব মাছচাষের ফলে এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে দেশি মাছ চাষ করার ব্যাপারে অনীহার কারণেও আমরা হারিয়ে ফেলছি দেশীয় জাতের নানা মাছ।

চাষের মাছে কোনো স্বাদ নেই। অথচ ছোটো-বড়ো নানা জাতের দেশি মাছের স্বাদ, সে তো অতুলনীয়!

এছাড়া প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা ও জাটকা নিধনের কারণে রুপালি ইলিশও বিলুপ্তির পথে। ইলিশ রক্ষার বিষয়ে নানা উদ্যোগের কথা শোনা যায়। ইলিশের ব্যবস্থাপনা নিয়ে এর আগে 'আন্তসীমান্ত সংলাপ'ও হয়েছে ভারতের সঙ্গে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে, ভারতের কার্যকর সহযোগিতা ছাড়া ইলিশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সম্ভব নয়। কারণ বাংলদেশ ও ভারতের বেশকিছু অভিন্ন নদী রয়েছে। পদ্মাসহ বেশকিছু নদী ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে এসেছে। দু-একটি নদীর উজানে বাঁধ দেওয়ায় স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্রোত তো দূরের কথা, যদি পর্যাপ্ত পানি না থাকে, তবে ইলিশ বাঁচবে কীভাবে? ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের পদ্মাসহ কয়েকটি নদীর শীর্ণদশা। বর্ষা মৌসুম ছাড়া নদীতে পানি থাকে না। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে ইলিশের উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ শুরু হলে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। যে পদ্মা নদী ছিল ইলিশের বিচরণক্ষেত্র, সেই নদীই এখন মৃতপ্রায়।

বিধিবিধানের ফাঁকফোকর দিয়ে চলছে নির্বিচারে ধ্বংসযজ্ঞ। লক্ষ-কোটি বছর ধরে একটি পাহাড় সৃষ্টি হয়। মানুষের সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের কারণে সেই পাহাড় কেটে তারা বসতি স্থাপন করছেন। এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে মারাত্মকভাবে।

আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সংকট আরও ঘনীভূত হবে। বাড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। অথচ মাত্র এক মিটার উচ্চতা বাড়লেই দেশের সাড়ে ১৭ ভাগ ভূমি সাগরতলে হারিয়ে যাবে চিরতরে। ভাবা যায়? এমনিতেই জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ বাংলাদেশ। সাগরতলে ভূমি হারিয়ে গেলে কয়েক কোটি লোক পরিবেশ আর জলবায়ু শরণার্থী হবে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের সবচেয়ে যে বড়ো ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনও সাগরকোলে তলিয়ে যাবে। বাংলাদেশের কৃষি, জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হবে মারাত্মকভাবে। এ অবস্থায় টেকসই পরিবেশ বজায় রাখাই বিরাট চ্যালেঞ্জ।

বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ সুন্দরবন আমাদের জন্য প্রকৃতির এক অপরূপ দান। ঝড়ঝাপ্টা থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক অনেক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে সুন্দরবন। এখানকার জীববৈচিত্র্য এই বনকে দিয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। সুন্দরবনে রয়েছে ৫ হাজার প্রজাতির সম্পূরক উদ্ভিদ,

> প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে মানুষ তথা প্রাণিকুলের সঙ্গে সহাবস্থান করে কীভাবে একসঙ্গে চলে পরিবেশের আরও উন্নয়ন ঘটানো যায়, সেটিই পরিবেশ সাংবাদিকতার মূল কথা। রিপোর্ট, ফিচার, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, এমনকি ফটোগ্রাফিতেও পরিবেশ সংরক্ষণের ভারসাম্যের বিষয়টি প্রাধান্য পাবে

এখানে-ওখানে বড়ো বড়ো চর পড়ে একদার প্রমত্তা পদ্মার মৃত্যু প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। শুধু বর্ষাকালের তিন-চার মাস ছাড়া সারা বছর নদীতে পানি থাকে না বললেই চলে। দেশের অন্য নদীগুলোরও একই অবস্থা। তাহলে আমাদের প্রিয় মাছ ইলিশ কোথায় যাবে? কোথায় অবাধে তার বংশবৃদ্ধি হবে, যেখানে ছোটো জাটকা সহজেই বেড়ে একটি উপাদেয় ইলিশে পরিণত হবে? আসলে প্রায় দুই যুগ ধরে যেন ইলিশের জন্য একটি প্রতিকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে ইলিশ একদিন বিলুপ্ত হতে পারে। এ ব্যাপারে এখনই ইলিশবান্ধব একটি প্রতিবেশ তৈরির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

হারানো নদী পুনরুদ্ধার, নদীর নাব্য বৃদ্ধি, নদীদূষণ রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মৎস্যচাষিদের দেশীয় মাছ চাষের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি। জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সংকটের কারণে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। উজাড় হচ্ছে বন। আমাদের ঐতিহ্য সুন্দরবন, মধুপুরের শালবন, পার্বত্য অঞ্চলের বন-বনানী আজ ধ্বংসের মুখে। চট্টগ্রামে পাহাড় কেটে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টি করা হচ্ছে। একটু বৃষ্টিতেই পাহাড়ধসে মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। পরিবেশবিষয়ক আইন ও

১৯৮ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ১২৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ৫৭৯ প্রজাতির পাখি, ১২৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ৩০ প্রজাতির চিংড়ি মাছ।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনের অন্যতম আকর্ষণ। এই বনকে ঘিরেই বহু মানুষের জীবন-জীবিকা চলছে। বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পেও সুন্দরবন এক অসাধারণ ভূমিকা রেখে চলেছে। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে–সুন্দরবন আজ নানা কারণেই ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। অথচ এই বনকে রক্ষা করতে না পারলে জলবায়ুর পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশকে আরও দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হবে। এজন্য সুন্দরবন রক্ষায় সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

২০০১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের আওতায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রূপান্তর ও পরশের উদ্যোগে এবং দেশের আরও ৭০টি পরিবেশবাদী সংগঠনের অংশগ্রহণে প্রথম জাতীয় সুন্দরবন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে ১৪ ফেব্রুয়ারিকে 'সুন্দরবন দিবস' ঘোষণা করা হয়। সত্যি বলতে কী, আমাদের অস্তিত্বের স্বার্থেই সুন্দরবনকে ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই।

তেল-গ্যাস আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধানী উদ্যোগ বন্ধ, আইনানুগ সম্পদ আহরণকারীদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত, বন ও বন্যপ্রাণী আইনকে আরও যুগোপযোগী এবং প্রয়োজনে পৃথক বন আইন, বনের ভেতর ও পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর সংস্কার, বিশেষ করে গোরাই নদীশাসনের ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো, সুন্দরবন এলাকায় চিংড়ি পোনা ধরার কারণে মাছসহ জলজসম্পদের যে ক্ষতি হচ্ছে, তা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার যে দাবি জানানো হচ্ছে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে, সেগুলোও আমলে নিতে হবে। সুন্দরবন আমাদের ভালোবাসার ধন। আমরা কোনোভাবেই তা হারাতে চাই না।

পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, আর্সেনিকদূষণ, মাটিদূষণ আরও জটিল করে তুলছে আমাদের পরিবেশ-প্রতিবেশ সমস্যাকে। রাজধানী ঢাকা এখন নানা দিক থেকেই বাস অনুপযোগী শহর হয়ে উঠছে। বিশেষ করে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় লোকজনকে দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হচ্ছে। যত্রতত্র যখন-তখন খোঁড়াখুঁড়ির কারণে সৃষ্টি হচ্ছে ধুলার। সকালে বাসা-বাড়ি থেকে বের হয়ে লোকজনকে রীতিমতো ধুলায় গোসল করে ফিরতে হয়। ওয়াসা, ডেসা, তিতাস–এক সংস্থা রাস্তা খুঁড়ে কাজ শেষ করে তো আরেক সংস্থা শুরু করে। এতে যেমন রাষ্ট্রের অর্থের শ্রাদ্ধ হয়, তেমনই ভোগান্তিও বাড়ে। এক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আরেক মন্ত্রণালয়ের কাজের কোনো সমন্বয় না থাকায় যুগ যুগ চলছে এই জগাখিচুড়ি অবস্থা।

বাস্তবতা হচ্ছে, ঢাকা বিশ্বের দূষিত নগরগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটা বারবার বিভিন্ন জরিপে উঠে আসছে। সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণবিষয়ক সংস্থা ইপিএ-এর প্রতিবেদনে বিশ্বের দূষিত বায়ুর দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের যে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে তা উদ্‌বেগজনক। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাতাস দূষিত এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গত এক যুগে ৫৪ ধাপ নিচে নেমেছে। এর আগেও বিভিন্ন জরিপে বিশ্বে দূষিত বায়ুর শহরগুলোর মধ্যে ঢাকার শোচনীয় অবস্থার কথা উঠে এসেছে।

১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে বায়ুদূষণ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ভারত ও বাংলাদেশে। আর এই দূষণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির ঝুঁকিতে আছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা হেলথ ইফেক্টস ইনস্টিটিউট এবং ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিকস অ্যান্ড ইভালুয়েশনের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়। প্রতিবেদনে বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশে বছরে ১ লাখ ২২ হাজার ৪০০ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে বলে বলা হয়েছে। আর বায়ুদূষণের কারণে শিশুমৃত্যুর হারের দিক থেকে পাকিস্তানের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত উদ্‌বেগজনক ব্যাপার।

ঢাকার আশপাশসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যত্রতত্র গড়ে উঠেছে ভাঁটা। এসব ভাঁটা বায়ুদূষণের জন্য ৫৮ শতাংশ দায়ী। কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই ফসলি জমি ও আবাসিক এলাকায় গড়ে তোলা হচ্ছে এসব ভাঁটা। বায়ুদূষণের কারণগুলোর মধ্যে ভাঁটার পরই রয়েছে ধুলাবালি। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন ভবন। কিন্তু এসব স্থাপনা তৈরির সময় মানা হচ্ছে না ইমারত নির্মাণবিধি।

এছাড়া বিভিন্ন স্থানে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি, সড়ক নির্মাণ, বাড়িঘর নির্মাণ ও ভাঙাচোরা রাস্তায় যানবাহন চলাচলের কারণে বাতাসে ধুলার পরিমাণ অত্যধিক মাত্রায় বেড়েছে। যদি সমন্বয় থাকত, তাহলে এ অবস্থা হতো না। তাছাড়া রাজধানীর কোথাও না কোথাও নির্মাণকাজ চলছেই। এ কারণেও সৃষ্টি হচ্ছে ধুলার, যা দূষণের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছে। বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত মেগাসিটির তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ঢাকা। ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বায়ুদূষণজনিত অসুখে বছরে সাড়ে আট হাজার শিশু মারা যায়।

দখল-দূষণে ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর করুণ অবস্থা। এছাড়া যানজট, যানবাহন ও কলকারখানার কালো ধোঁয়া, ট্যানারি বর্জ্য, খাদ্যে ভেজাল, সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিম্নমানও ঢাকার জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অধিক জনসংখ্যার চাপে ন্যুজ এ শহরে নেই পয়ঃনিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা। জনসংখ্যা বাড়ছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গাড়িঘোড়া। কিন্তু সে তুলনায় রাস্তাঘাট, হাসপাতাল স্কুল-কলেজ, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি প্রভৃতি নাগরিক সেবা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ রাজধানী ঢাকাই দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র।

দেশের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি মানুষ এখন শহরে বাস করছে। এজন্য পরিকল্পিত নগরায়ণের কোনো বিকল্প নেই। ঢাকা আবাসস্থল থেকে পরিণত হয়েছে বিরাট বাজারে। বস্তুত এ শহরের সুনির্দিষ্ট কোনো চরিত্র নেই। যত্রতত্র যে যেখানে পারছে, যে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। এতে নগরী তার বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে। এক জগাখিচুড়ি অবস্থায় রাজধানীবাসী এখানে বাস করছে। এ কারণে অনেক নাগরিক সুবিধা থেকেই তারা বঞ্চিত হচ্ছে। শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য এ নগরী যেন নরকতুল্য। খেলার মাঠ নেই, নেই জলাশয়। সবুজ গাছগাছালির দেখা মেলাও ভার।

মানুষের লোভ-লালসা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনদিন। সর্বগ্রাসী মানসিকতার কাছে হার মানছে আইনকানুন, মানবিকতা–সব। ফলে প্রাণ যাচ্ছে নিরীহ মানুষের। প্রতিবছর পাহাড়ধসে ঘটছে প্রাণহানির ঘটনা। এটাই যেন নিয়ম কিংবা নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ের ওপর থেকে গাছ কেটে, ট্রাকে ট্রাকে মাটি কেটে পাহাড়কে ন্যাড়া করে ফেললে বৃষ্টি-বাদলায় তার ধসে পড়া ছাড়া আর কি কোনো উপায় থাকে? আর পাহাড়ের ঢালুর নিচে যেসব অসহায় মানুষ বসতি স্থাপন করে, তাদের মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়। অকাতরে প্রাণ যায় এসব ভাগ্যাহত মানুষের। যারা সমতলে জায়গা না পেয়ে জীবনের অমোঘ টানে এই বিপজ্জনক জায়গাকেই বাসস্থান হিসাবে বেছে নেয়।

ইতঃপূর্বে চট্টগ্রামের ১২টি পাহাড়কে ভূমিধসের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সরকারিভাবে গঠিত তিনটি বিশেষজ্ঞ কমিটি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন ও কক্সবাজার পৌরসভার ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়গুলোয় বসবাসকারী প্রায় ১০ লাখ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার সুপারিশ করেছিল। কার্যকর হয়নি সেই সুপারিশও।

লাখ লাখ বছরের ভূপ্রাকৃতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখাই শুধু নয়, মানুষের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য এই পাহাড়গুলোর বেঁচে থাকটাও সমান জরুরি। কিন্তু মানুষ তার লোভ ও লাভের হিংস্র থাবা বসিয়েছে পাহাড়ের ওপর। পাহাড় কেটে সমতল ভূমি তৈরি করছে। এতে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

পরিবেশের ওপর অব্যাহত অত্যাচারের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের পিছু ছাড়ছে না। বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীর বাসস্থান ও জ্বালানি সংগ্রহের কারণেও পাহাড় ধ্বংস হচ্ছে। পাহাড় কাটা রোধ করতে হলে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারীদের সরিয়ে দিতে হবে। আপৎকালীন অবস্থায় শুধু পাহাড়ে বসবাসকারীদের নিরাপদস্থলে সরে যাওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের নির্দেশ জারি করলেই চলবে না। এজন্য স্থায়ী পুনর্বাসনব্যবস্থা জরুরি। মনে রাখতে হবে–পাহাড় ঘিরে যদি অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ করা না যায়, তাহলে পাহাড় কাটা কোনোদিন বন্ধ করা যাবে না। পাহাড়ের কান্নাও থামবে না।

পরিবেশদূষণের বিষয়টি ভয়াবহ। রাষ্ট্র ও সমাজের কেউই রেহাই পায় না। এই দূষণ রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেও থাকে না। গোটা অঞ্চল তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। চলতি বছর ৩১ অক্টোবর বিশ্বব্যাংকের 'কান্ট্রি ক্লাইমেট ও ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের ৩২ শতাংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী পরিবেশদূষণ। দূষণে প্রতি ১ লাখের মধ্যে ১৬৯টি শিশু অকালে মারা যায়। বাংলাদেশের প্রায় শতভাগ মানুষ বেশির ভাগ সময় দূষিত বায়ুর মধ্যে থাকে এবং পানিদূষণের কারণে ডায়রিয়া, কলেরাসহ নানা রোগ বাড়ছে। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মশাবাহিত ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার মতো রোগে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে দেশের চারটি অঞ্চলকে পরিবেশের দিক থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলা হয়েছে। এগুলো হলো যথাক্রমে বরেন্দ্র, পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূল ও হাওড় এলাকা। পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বিচারে পাহাড় ও বন ধ্বংস করে নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির স্তর ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। নদীর পানির প্রবাহ বাড়ানোর কার্যকর উদ্যোগ থাকতে হবে। হাওড়াঞ্চলে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা ফসল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পরিবেশের দিক থেকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল। প্রায় প্রতিবছর সেখানে ঘূর্ণিঝড় হানা দেয়। লবণাক্ততার কারণে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবিকাও মারাত্মক হুমকির মুখে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উদ্‌বেগজনক তথ্য হলো–পরিবেশদূষণ আমাদের উন্নয়নের গতিও থামিয়ে দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রতিবছর ১০০ কোটি ডলারের ক্ষতি হয় এবং পরিবেশদূষণে জিডিপির ৮ শতাংশ খোয়া যায়। একসময় ঢাকা শহর থেকে পরিবেশদূষণকারী পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আবার তা ফিরে এসেছে। পরিবেশদূষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের সব উন্নয়ন হতে হবে পরিবেশ সহায়ক। উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ বন, নদী, জলাভূমি, সৈকত ধ্বংস করা যাবে না। শিল্পকারখানা করার ক্ষেত্রে পরিবেশ আইন শতভাগ মেনে চলতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন, ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে ষষ্ঠ স্থানে। তাপমাত্রা ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে দেশে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা প্রভৃতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি। পালটে যাচ্ছে ঋতুর ধারাক্রম। এ কারণে মানুষের চিরচেনা স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহই আজ ব্যাহত।

এ কারণে প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণিকুলের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পরিবেশবিষয়ক সাংবাদিকতা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য পরিবেশ বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। লেখার মাধ্যমে তাদের অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে। পরিবেশবাদী সংগঠন নিয়ে বেশি করে খবর প্রকাশ করতে হবে। সাংবাদিকতার মাধ্যমে সংগঠনগুলোকে সহযোগিতা করতে হবে। পরিবেশসংক্রান্ত আইনকানুন নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাও পরিবেশ সাংবাদিকতার অংশ। পরিবেশ মন্ত্রণালয় আছে, আছে পরিবেশ অধিদপ্তর। তাদের কার্যক্রম নিয়েও প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে পরিবেশ সাংবাদিকতার গতিপ্রকৃতি ও পরিধি বাড়াতে হবে। এবং তা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট, ডেপুটি এডিটর, জাগো নিউজ

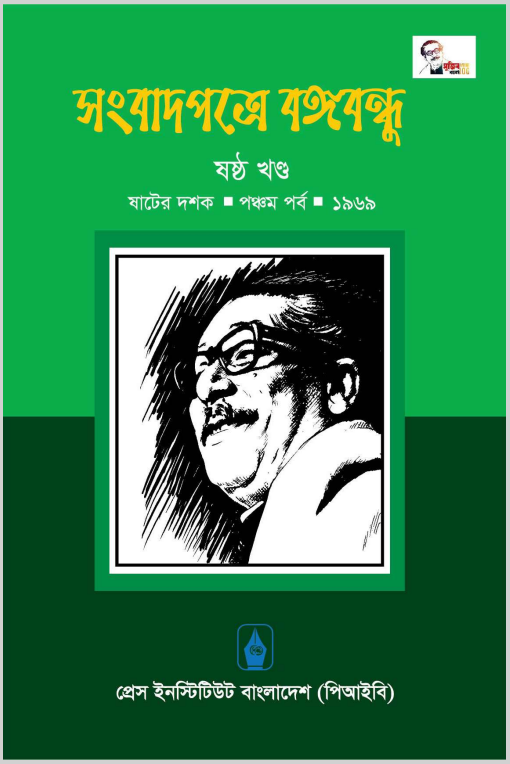

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

গ্রিনহাউজ গ্যাস, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভুক্তভোগী বাংলাদেশ

মাহফুজুর রহমান মানিক

খবর হিসাবে সাংবাদিকতার এক বড়ো অংশজুড়ে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ যেহেতু গ্রিনহাউজ গ্যাস, তাই পরিবেশ সাংবাদিকতায় এটি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণে ভূমিকা না রাখলেও আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি শিকার। উন্নত বিশ্ব এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোর গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের কারণে শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা বিশ্বই হুমকিতে। বাংলাদেশ তার ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়েই জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে নজর দিয়েছে।

গ্রিনহাউজ গ্যাস

১৮ আক্টোবর বিশ্বের অন্যতম ধনী বিল গেটস তার ব্লগ গেটসনোটসে লিখেছেন, দ্য স্টেট অব দ্য এনার্জি ট্রানজিশন বা জ্বালানি রূপান্তর পরিস্থিতি। সেখানে ঘুরেফিরে তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বলেছেন। বলেছেন গ্রিনহাউজ গ্যাসের কথা। বস্তুত পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারক গ্যাসই গ্রিনহাউজ গ্যাস। যেমন: কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন, জলীয়বাষ্প প্রভৃতি। বায়ুমণ্ডলে নিঃসরিত গ্রিনহাউজ গ্যাসের ৮০ শতাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড, ১০ শতাংশ মিথেন, ৭ শতাংশ নাইট্রাস অক্সাইড এবং বাকি ৩ শতাংশ অন্যান্য গ্রিনহাউজ গ্যাস। এগুলোর মধ্যে ডাইঅক্সাইডের স্থায়িত্বকাল বায়ুমণ্ডলে প্রায় একশ বছর। মিথেন গ্যাসের স্থায়িত্বকাল প্রায় ১২ বছর। নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের স্থায়িত্বকালও একশ বছরের ওপরে। এগুলো দীর্ঘ মেয়াদে বায়ুমণ্ডলে থাকতে থাকতেই নতুন গ্যাস জমা হয়। পৃথিবীর তাপমাত্রা এভাবেই বৃদ্ধি হতে থাকে। বিল গেটস যুক্তরাষ্ট্রের থিংকট্যাংক রোডিয়াম গ্রুপের সৌজন্যে দেখিয়েছেন কার্বন নিঃসরণে আবাসন খাতের ভূমিকা ৭ শতাংশ, পরিবহণের ১৬ শতাংশ, কৃষির ২১ শতাংশ, বিদ্যুৎ খাতে ২৬ শতাংশ এবং উৎপাদন খাতে ৩০ শতাংশ।

সৌজন্যে প্রথম আলো

গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের জন্য দায়ী কারা

গত বছর তথা ২০২১ সালে ২ নভেম্বর বিবিসি বাংলায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। শিরোনাম ছিল–কপ২৬: সবচেয়ে বেশি কার্বন নির্গমনকারী দেশগুলো কি কথা রেখেছে? এ বছর কপ২৭ তথা জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৬ থেকে ১৮ নভেম্বর।

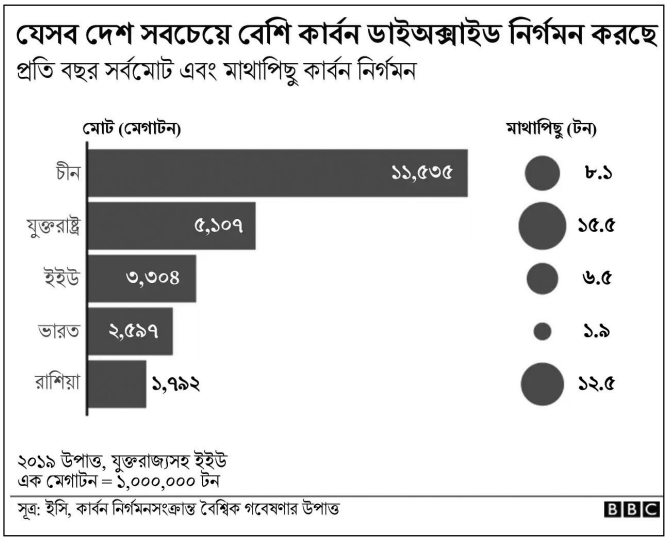

সৌজন্যে বিবিসি বাংলা

বিবিসি বাংলা লিখেছে, পৃথিবীর বাতাসে যত কার্বন ডাইঅক্সাইড মিশছে, এর অধিকাংশই আসছে মাত্র চারটি দেশ থেকে–চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও রাশিয়া। সঙ্গে আছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। প্রতিবেদনটির সঙ্গে বিবিসির গ্রাফেও আমরা দেখতে পাচ্ছি চীন প্রতিবছর ১১ হাজার ৫৩৫ মেগাটন কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন করে। তালিকায় ৫ হাজার ১০৭ মেগাটন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও মাথাপিছু আয়ে দেশটি শীর্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা প্রত্যেকে গড়ে ১৫.৫ টন কার্বন নিঃসরণ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর চতুর্থ অবস্থানে আছে আমাদের প্রতিবেশী ভারত। ভারতের ক্রমবর্ধমান কার্বন নিঃসরণের হার গত দুই দশকে স্পষ্ট। যদিও কার্বন নির্গমনের দিক থেকে শীর্ষ পাঁচ দেশের মধ্যে ভারতেরই মাথাপিছু নির্গমনের হার কম।

তাছাড়া উন্নত বিশ্ব এবং শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলো বেশি কার্বন নিঃসরণ করছে। পৃথিবীতে গ্রিনহাউজ নিঃসরণের ফলে বায়ুমণ্ডলে পুঞ্জীভূত গ্রিনহাউজ গ্যাস বর্তমানে ২ মিলিয়ন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বলে জাতিসংঘ আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন প্যানেলের (আইপিসিসি) সাম্প্রতিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন বলছে। ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। ২০৩০-২০৪০ সালের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ নিঃসরণ কমাতে না পারলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন।

গ্রিনহাউজ গ্যাস, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাংলাদেশে এর প্রভাব

গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণে ভূমিকা অতি নগণ্য হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের অভিঘাত যে কয়টি দেশ সবচেয়ে বেশি মোকাবিলা করছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এমনভাবে আমাদের জীবনে ঘিরে আছে এবং এমন ক্ষেত্রে এটি ভূমিকা রাখছে, যেটি সাধারণভাবে অবোধগম্য। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, এ বছর অক্টোবরে ডেঙ্গুজ্বরে যে ভয়ংকর রূপ আমরা দেখেছি, স্বাভাবিকভাবে এমনটি হওয়ার কথা নয়। কারণ বর্ষা মৌসুমের সঙ্গে ডেঙ্গুর সম্পর্ক থাকার কারণ, জমে থাকা পানিতেই প্রধানত এডিস মশার প্রজনন বেশি হয়। প্রতিবছর সেপ্টেম্বরেই বর্ষা সাধারণত শেষ হয়ে যায়, সেই সঙ্গে ডেঙ্গুও চলে যায়। এবার কিছুটা দেরিতে বর্ষা আসায় ডেঙ্গুর সময়ও প্রলম্বিত হয়েছে। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখানেও স্পষ্ট। সমকালের প্রতিবেদন অনুসারে, ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে অক্টোবরের প্রথম ১৬ দিনে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৯ হাজারের বেশি এবং মারা গেছেন ৩৯ জন; এবার ২০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যায় ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এই অক্টোবরে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা, খরা কিংবা যে ঘূর্ণিঝড় দেখছি, সেখানেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব স্পষ্ট। ২৪ অক্টোবর বাংলাদেশ দেখে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের তাণ্ডব। ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে ফণী, আম্ফান, ইয়াস এবং সর্বশেষ সিত্রাং। প্রায় প্রতিটি ঝড়েই যেমন প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে, তেমনই ক্ষতি হয়েছে ফসলেরও। সিত্রাং কেড়ে নেয় ৩৮ প্রাণ। ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত, উপড়ে যায় গাছপালা-বিদ্যুতের খুঁটি, ভেসে যায় ঘেরের মাছ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক তথ্য বলছে, ৫৮ হাজার ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০০৭ সালে বাংলাদেশে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরের কথা আমাদের মনে আছে। বর্ষার সময় বৃষ্টি না হওয়া, শীতকালে শীত না হওয়া, সমুদ্রে ঘনঘন বিপৎসংকেত–এর সবই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ অব্যাহত থাকলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এর ফলে সমুদ্র স্ফীতির মুখোমুখি হতে পারে। তাতে স্থায়ীভাবে প্লাবিত হওয়া ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে দেশের ব্যাপক উপকূলীয় এলাকা ও অন্যান্য নিম্নাঞ্চলে বসবাস এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য উপযুক্ততা হারাবে। এসব এলাকার মানুষ যে শুধু আর্থসামাজিক বিপর্যয়ের কবলে পড়বেন তাই নয় বরং তাদের মধ্যে অসংখ্যজন উদ্‌বাস্তুর কাতারে যোগদান করতে বাধ্য হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাড়ছে ঘূর্ণিঝড়। সর্বশেষ আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ে লন্ডভন্ড উপকূল, সৌজন্যে সমকাল

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশ্নে ন্যায্যতা ও ক্ষতিপূরণ:

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উন্নত বিশ্ব ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলো দায়ী হলেও এর ভুক্তভোগী বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল কিছু দেশ। এ কারণেই এখানে ন্যায্যতার প্রশ্ন আসছে। অপরাধ না করেও উন্নয়নশীল বিশ্ব যে ক্ষতির শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে, তা মোকাবিলায় উন্নত বিশ্বের দুটি প্রধান দায়িত্ব। প্রথমটি গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমণ বন্ধ করা; দ্বিতীয়ত, আমাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। জলবায়ু পরিবর্তনে যাদের তেমন ভূমিকা নেই, সেসব ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জনগণের প্রতি ন্যায়বিচারের স্বার্থেই তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। কিন্তু এ ব্যাপারে উন্নত বিশ্বের আচরণ খুবই দুঃখজনক। যদিও চীন, যুক্তরাষ্ট্র কিংবা কার্বন নিসরণে যারা দায়ী, তারা নিঃসরণ কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; তারপরও বাস্তবতা বলছে ভিন্নকথা। আন্তর্জাতিক এনার্জি এজেন্সির মতে, চীনকে তার জলবায়ুসংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে দেশটিকে ২০৬০ সালের মধ্যে কয়লার চাহিদা ৮০ শতাংশেরও বেশি কাটছাঁট করতে হবে। অথচ চীনে এখনো কয়লাভিত্তিক নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রও কার্বন নিঃসরণ কমানোর কথা বলেছে। তারা ২০৩০ সালের মধ্যে নতুন গাড়ির অর্ধেক বৈদ্যুতিক গাড়ি করার ঘোষণা দেওয়াসহ আরও পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও কর্মসূচি যথেষ্ট নয় বলে দাবি করছে ক্লাইমেট অ্যাকশন ট্র্যাকার। তাদের বক্তব্য, প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য অনুযায়ী বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রিতে সীমিত রাখতে হলে আরও উন্নতি ঘটাতে হবে।

অন্য দেশগুলোর অবস্থাও সে মাত্রায় প্রত্যাশিত নয়। তাছাড়া তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে দায়িত্ব, সেখানেও উদাসীনতা স্পষ্ট। তবে একটি স্বস্তির বিষয় হলো, উন্নত বিশ্ব তাদের দায় স্বীকার করেছে। সেজন্য তারা ক্ষতিপূরণেরও অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু উন্নত বিশ্ব যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলছে, সেটা তারা দিচ্ছে না। ক্লাইমেট পলিসি ইনিশিয়েটিভ বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ কমানোর নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে প্রতিবছর ৪.১৩ ট্রিলয়ন মার্কিন ডলার অর্থ প্রয়োজন, সেখানেও কার্পণ্যতা স্পষ্ট। সবুজ জলবায়ু ফান্ড, অভিযোজন ফান্ড প্রভৃতি ফান্ডে অর্থায়নের কথা থাকলেও অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না।

জলবায়ু তহবিল এবং বাংলাদেশের অভিযোজন

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বাংলাদেশ যেমন আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থ সহায়তা পাওয়ার চেষ্টা করেছে, একই সঙ্গে নিজেদের উদ্যোগেও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের মাধ্যমে সরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। একটি পরিসংখ্যান বলছে, ২০২০ রাজস্ব বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সরকার প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে। সরকার জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে। উন্নত বিশ্ব থেকেও কিছু সহযোগিতা পাওয়া গেছে। অর্থনীতিবিদ ও পিকেএসএফের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ২০২১ সালের ৩০ অক্টোবর সমকালে প্রকাশিত 'কপ২৬ ও সবুজ জলবায়ু তহবিল' শিরোনামের লেখায় দেখিয়েছেন, বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত সবুজ জলবায়ু থেকে কমবেশি ১০০ মিলিয়ন ডলার অর্থ পেয়েছে।

সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট জলবায়ু পরিবর্তজনিত কারণে মানুষ, জীববৈচিত্র্য এবং প্রকৃতির ওপর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় অভিযোজন ও প্রশমনের কাজ যেমন করছে, তেমনই কার্বন নিঃসরণের মান কমানোর লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণে ভূমিকা রাখছে। এ ট্রাস্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরি কার্যক্রমেও সহায়তা করে আসছে। ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সাইক্লোন শেল্টার কাম স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে, ভাসমান বেডে সবজি চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নদীর তীরে প্রতিরক্ষা বাঁধসহ আরও নানা অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কর্মকাণ্ডের একটি চিত্র

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সাংবাদিকতা

পরিবেশ সাংবাদিকতার অংশ হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। মনে রাখতে হবে, গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। একে কেবল পরিবেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে পারিপার্শ্বিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ও দেখতে হবে। যেমন: নারী ও শিশুর ওপর এর প্রভাব কীভাবে

পড়ছে। শিক্ষায় কী সংকট তৈরি করছে প্রভৃতি। গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্ক বা জিআইজেএন 'জলবায়ু সংকট: অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য আইডিয়া' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে আর্থ জার্নালিজম নেটওয়ার্কের নির্বাহী পরিচালক জেমস ফানের জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পরামর্শ এসেছে। জেমস ফানের পরামর্শ হলো– গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের প্রধান উৎস হিসাবে কয়লা, তেল ও খনিজ গ্যাস উত্তোলনের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হতে পারে; সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গোষ্ঠীস্বার্থ কোনোভাবে প্রভাবিত করছে কি না; জলবায়ু নিয়ে অ্যাকটিভিস্ট গ্রুপগুলোর কাজ নিয়ে অনুসন্ধান হতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ ও অভিযোজনের ক্ষেত্রে সমাধানের উদ্যোগগুলোকে অনুসন্ধানের আওতায় আনা; জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ বা অভিযোজনের জন্য কী কী করা দরকার, তা-ও অনুসন্ধান করা। জলবায়ু তহবিল থেকে অন্যরা কীভাবে অর্থ পাচ্ছে, বাংলাদেশ কীভাবে অর্থ পেতে পারে এবং এ তহবিলের অর্থ যথাযথভাবে খরচ হচ্ছে কি না, তাও সাংবাদিকের অনুসন্ধানে উঠে আসতে পারে।

গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের কারণে সৃষ্ট জলবায়ু সংকট আরও গভীর হওয়ারই ইঙ্গিত করছেন বিশেষজ্ঞরা। সেজন্য ভুক্তভোগী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ এর অভিযোজনের বিকল্প নেই। কিন্তু ন্যায্যতার জন্য উন্নত বিশ্বকে চাপে ফেলা এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ও জরুরি। এক্ষেত্রে যথাযথ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সাংবাদিকরা সহযোগিতা করতে পারে।

তথ্যসূত্র

1. Brummer, Hugh (2019); Climate Change, Sea-level Rise and Development in Bangladesh; Dhaka; University Press Limited.
2. https://www.gatesnotes.com/Energy/2022-State-of-the-Energy-Transition
3. https://www.bbc.com/bengali/news-59125836
4. http://www.bcct.gov.bd/site/page/e6fb75e8-f5e5-4bed-8adc-e6183e69353a/-
5. https://gijn.org/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F-%E0%A6%93%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0 %A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE/
6. https://samakal.com/t-20/article/211082753/%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A7%A8%E0%A7%AC-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81-%E0%A6%A4%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2
7. https://mahfuzmanik.com/2010/02/climate-change-2/
8. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ greenhouse_gas_emissions
9. https://meansandmatters.bankofthewest.com/article/sustainable-living/taking-action/who-funds-the-fight-against-climate-change/

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক

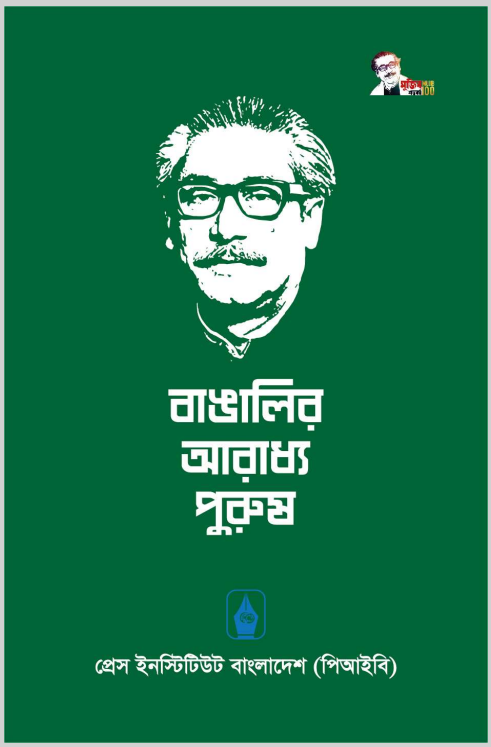

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

জলবায়ু পরিবর্তন, চুক্তি ও বৈশ্বিক উদ্যোগ

কামনা আক্তার
মাসুম বিল্লাহ আরিফ

'We still do not know one thousandth of one percent of what nature has revealed to us'

–Albert Einstein

আমাদের এই মহাবিশ্ব অসীম হলেও এতে প্রাণের অস্তিত্ব অতি নগণ্য। মানুষের চিন্তা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের আলোকে পৃথিবীই হলো মহাবিশ্বের প্রাণ ও প্রাণী, উদ্ভিদ ও তৃণলতার জন্ম, বিকাশ ও বেড়ে ওঠার একমাত্র স্থান। তাই সবুজ এই গোলকের শারীরিক অবস্থান মহাবিশ্বে তুচ্ছ হলেও প্রাণ ও প্রাণীর উপস্থিতি এর গুরুত্বকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। মানুষের জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষমতা যত বেড়েছে, ততই আমরা জেনেছি আমাদের পৃথিবী নানা কারণে আমাদের হাতেই নিরাপদ নয়। প্রতিনিয়ত আমরা এমনসব দূষণ করছি, যা পৃথিবীর অস্তিত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আর এতে সবচেয়ে বেশি হুমকিতে পড়ছে প্রাণ ও প্রাণী, উদ্ভিদ ও তৃণলতা।

শিল্পবিপ্লব ও যন্ত্রসভ্যতা মাটির পৃথিবীতে ঝাঁ চকচকে ভাব আনলেও দূষণের মাত্রা বাড়িয়েছে শতগুণ। প্রতিনিয়ত পৃথিবীজুড়ে কলকারখানা থেকে নিঃসরিত হয় বিপুল পরিমাণের কার্বন ও নানা দূষণ–উপাদান। প্রথমে কেউ এসবে মাথা না ঘামালেও ক্রমে ক্রমে কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে সবারই। বিশেষজ্ঞরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রাণীর বিলুপ্তি, সুপেয় পানির সংকট, রোগব্যাধির বিস্তারসহ বহু সমস্যা প্রত্যক্ষ করে। এভাবেই মানুষের বোধোদয় ঘটল–নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সুস্থ রাখতে হবে পৃথিবীর পরিবেশ ও জলবায়ু। এজন্যই গঠিত হয়েছে পরিবেশবিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন, আর সম্পাদিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চুক্তি।

পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

১. **মানব পরিবেশ সম্মেলন:** সুইডেনের একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৬৮ সালে মানব পরিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলি শনাক্ত করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও চুক্তির মাধ্যমে তা সমাধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানায়। চার বছর পর ১৯৭২ সালের ৫ থেকে ১৬ জুন স্টকহোমে ঐতিহাসিক মানব পরিবেশসংক্রান্ত জাতিসংঘের সম্মেলনটি (United Nations Conference of the human environment) অনুষ্ঠিত হয়। এটি পরিবেশবিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক বৃহৎ সম্মেলন। আর এর মাধ্যমে গৃহীত হয় UNEP।

২. **বুন্টল্যান্ড কমিশন:** জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮৩ সালে গঠন করে পরিবেশ ও উন্নয়নবিষয়ক বিশ্ব কমিশন (The World commission on environment and development)। তিনটি উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর এই পরিষদ ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কাছে তাদের একটি প্রতিবেদন পেশ করে। যে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে টিকিয়ে রাখতে কী করা দরকার, সে সম্পর্কে একটি সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ও চুক্তি তৈরি করতে জাতিসংঘকে আহ্বান জানানো হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ ১৯৯২ সালে United Nations conference of environment and development (UNCED) সম্মেলনের আয়োজন করে, যা Reo Summit বা Earth Summit বা ধরিত্রী সম্মেলন নামেও পরিচিত।

৩. **প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন:** ১৯৯২ সালের জুনে রিও ডি জেনিরোয় জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন কনফারেন্সের আয়োজন করে, যা ধরিত্রী সম্মেলন নামে পরিচিত। এই সম্মেলনে ১৭৮ দেশের প্রায় ১০ হাজার প্রতিনিধি এবং বেশকিছু বেসরকারি সংস্থা যোগদান করে। সম্মেলনটির বিশেষ দিক হলো–এতে পরিবেশবিষয়ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি কার্যসম্পাদিত হয়: ক. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), খ. Agenda-21।

ক. **United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC):** ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুন থেকে ১৪ জুন রিও ডি জেনেরোয় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন (UNCED) শীর্ষক সম্মেলনে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল:

* 'বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের হার এমন অবস্থায় স্থিতিশীল রাখা, যাতে জলবায়ুগত মানবিক পরিবেশের জন্য তা বিপত্তিকর না হয়।'

UNFCC প্রতিবছর Conference of the parties (COP) নামে জলবায়ু সম্মেলন আয়োজন করে থাকে। সাম্প্রতিক মিশরের শার্ম আল শেখরে আয়োজিত হয় COP-27।

খ. **Agenda-21:** পরিবেশবিষয়ক যে সমস্যাগুলো রয়েছে, সেগুলো সমাধানে সরকারি বেসরকারি বা ব্যক্তিপর্যায়ে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে। এজেন্ডা ২১-এ চারটি পর্বে ৪০টি অধ্যায় রয়েছে। টেকসই উন্নয়নের (Sustainable Development) রূপরেখা বলেও একে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৪. **দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধরিত্রী সম্মেলন:** দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়, যা Earth Summit +05 হিসাবে পরিচিত। এই সম্মেলনে পানি, জ্বালানি, পরিবহণ, পর্যটনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে তৃতীয় ধরিত্রী সম্মেলন (World Summit on Sustainable Development, WSSD) অনুষ্ঠিত হয়। টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে এটি প্রথম সম্মেলন ছিল।

প্রথম ধরিত্রী সম্মেলনের ২০ বছর পূর্তিতে ২০১২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোয় টেকসই উন্নয়নবিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন (United Nations Conference on Sustainable Development) অনুষ্ঠিত হয়। আর এই সম্মেলনেই টেকসই উন্নয়নে 'সবুজ অর্থনীতি' গড়ে তোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

জলবায়ুবিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

১. **গ্রিনপিস:** একটি বেসরকারি আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংস্থা। নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। ষাটের দশকের শেষার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার ভূমিকম্পপ্রবণ আমচিটকা দ্বীপে পরমাণু অস্ত্রের ভূগর্ভস্থ পরীক্ষার প্রতিবাদে ১৯৬৯ সালে কানাডার ভ্যাঙ্কুয়ার Don't Make a Wave Committee গঠিত হয়, যা ১৯৭১ সালে গ্রিনপিস নাম ধারণ করে। প্রতিষ্ঠানটি রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন পরিচালনা করছে।

২. **ইউএনইপি:** এ সংস্থা গঠিত হয় ১৯৭২ সালে। এর সদর দপ্তর কেনিয়ার নাইরোবিতে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন যাতে পরিবেশগত ঝুঁকিপূর্ণ না হয়, সেজন্য পরিবেশের সংরক্ষণ করে জাতি ও মানুষের জীবনমান উন্নত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদান এবং পরিবেশবিষয়ক অংশীদারত্বমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা এই সংস্থার মুখ্য লক্ষ্য।

৩. **আইইউসিএন:** জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে মূল লক্ষ্য হিসাবে ধরে এই সংস্থার যাত্রা শুরু। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের গ্লান্ড শহরে। ১৯৪৮ সালের অক্টোবরে International Union for the Protection of Nature নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৬ সালে International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources-এ পরিণত হয়। এর মূল লক্ষ–প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা।

৪. **আইপিসিসি:** বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সংগঠন জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৮৮ সালে গঠিত হয় Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)। এটি একটি পরিবেশবিষয়ক সংস্থা এবং বিশ্বের নামিদামি ২ হাজার ৫০০ জন বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞের একটি বিশাল নেটওয়ার্ক; যারা জলবায়ুবিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলো মূল্যায়ন করে, মতামত দেয়। এটি UNEP ও WMO-এর যৌথ উদ্যোগে ১৯৮৮ সালে গঠিত হয়।

৫. **ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার:** সুইজারল্যান্ডের গ্লাডভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা। বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ করে।

৬. **ভি-২০:** ভি-টোয়েন্টি বা 'ভালনারেবল টোয়েন্টি' গঠিত হয় ২০১৫ সালে। পেরুর রাজধানী লিমায় ফিলিপাইনের উদ্যোগে এটি গঠিত হয়। বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জলবায়ুর ঝুঁকিতে থাকা ৭০ কোটির বেশি মানুষের বসবাসকারী ২০টি দেশ নিয়ে গঠিত জোট। প্রতিষ্ঠাকালীন রাষ্ট্রের সংখ্যা মাত্র ২০টি থাকলেও

শিল্পবিপ্লব ও যন্ত্রসভ্যতা মাটির পৃথিবীতে ঝাঁ চকচকে ভাব আনলেও দূষণের মাত্রা বাড়িয়েছে শতগুণ। প্রতিনিয়ত পৃথিবীজুড়ে কলকারখানা থেকে নিঃসরিত হয় বিপুল পরিমাণের কার্বন ও নানা দূষণ–উপাদান। প্রথমে কেউ এসবে মাথা না ঘামালেও ক্রমে ক্রমে কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে সবারই।

বর্তমানে এর সদস্য ৪৮। মূল লক্ষ্য–জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা।

জলবায়ুবিষয়ক চুক্তি

এখন পর্যন্ত জলবায়ুবিষয়ক বেশ কয়েকটি বহুজাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সবকটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই চমৎকার। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চুক্তি হলো:

ক. **মন্ট্রিল প্রটোকল:** ১৯৮৫ সালে এন্টার্কটিকা মহাদেশের ওপরে পৃথিবীর ওজোন স্তরে একটি ছিদ্র আবিষ্কৃত হয়, যার মধ্য দিয়ে সূর্যের ক্ষতিকর বেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে সরাসরি প্রবেশ করছিল। তখন বিশ্বব্যাপী একটি স্পষ্ট সতর্কবার্তা ছড়িয়ে পড়ে, কারণ এই রশ্মি মানুষ ও জীবজগতের অস্তিত্বের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কানাডার মন্ট্রিল শহরে ওজোন স্তর সুরক্ষাবিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, আর এটিই মন্ট্রিল চুক্তি নামে পরিচিত। তবে চুক্তিটির পূর্ণনাম হলো Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer এবং এটি কার্যকর হয় ১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি। প্রাথমিকভাবে ৪৬টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এখন পর্যন্ত ১৯৭টি দেশ এই চুক্তির সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করেছে। কার্যকারিতা ঠিক রাখার জন্য চুক্তিটি মোট ছয়বার (১৯৯০, ১৯৯২, ১৯৯৫, ১৯৯৭, ১৯৯৯ ও ২০১৬) সংশোধন করা হয়েছে।[১]

খ. **কিয়োটো প্রটোকল:** এটি একটি বহুজাতিক চুক্তি। এর লক্ষ্য হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাসের নির্গমন হ্রাস করা। এই চুক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ চুক্তি হিসাবে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছিল। প্রটোকলটি ১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর জাপানের কিয়োটোতে স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে একে কিয়োটো প্রটোকল বলা হয়। তবে সম্পূর্ণ নাম হলো Kzoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change। চুক্তিটি ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারিতে কার্যকর হয়। উল্লেখ্য, এই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে এতে স্বাক্ষরকারী শিল্পোন্নত দেশগুলোর গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ ১৯৯০ সালের পর্যায়ের চেয়ে গড়ে ৫.২ শতাংশ হ্রাসের আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে যুক্তরাজ্য জলবায়ু পরিবর্তন আইন-২০০৮ প্রণয়ন করে। কিন্তু এই প্রটোকল থেকে কয়েকটি নেতৃস্থানীয় দেশ বেরিয়ে যায়। যেমন: মাথাপিছু শীর্ষ গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র (২০০১), কানাডা (২০১২)।

গ. **কার্টাগেনা প্রটোকল:** জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা পরিমার্জিত প্রাণের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কানাডার মন্ট্রিলে ২০০০ সালের ২৯ জানুয়ারিতে যে প্রটোকল গৃহীত হয়, সেটিই কার্টাগেনা প্রটোকল। সংক্ষেপে যাকে জৈব নিরাপত্তা প্রটোকল বলা হয়। এটি কার্যকর হয় ২০০৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর।

ঘ. **নাগোয়া প্রটোকল:** পৃথিবীব্যাপী বন ও প্রবাল প্রাচীরসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ঐতিহাসিক চুক্তি নাগোয়া প্রটোকল জাপানের নাগোয়া শহরে ২০১০ সালে স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৩টি দেশ ১০ বছরব্যাপী ২০২০ সাল নাগাদ কার্বনদূষণ বন্ধ, বন ও প্রবাল প্রাচীর রক্ষা, স্থল ও জলভাগের অংশবিশেষ সংরক্ষণ এবং মৎস্যসম্পদ টিকিয়ে রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার করেছে রাষ্ট্রগুলো।

গ. **প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ২০১৫:** এই চুক্তিটি জলবায়ুবিষয়ক আশাজাগানিয়া একটি প্রয়াস। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ১৭৫টি দেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। 'কপ২১'-এ (৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০১৫) স্বাক্ষরিত এই চুক্তির মূল লক্ষ্যগুলো হলো:

* বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের (৩.৬ ফারেনহাইট) কম রাখা।
* গাছ, মাটি ও সমুদ্র প্রাকৃতিকভাবে যতটা শোষণ করতে পারে, ২০৫০ থেকে ২১০০ সালের মধ্যে কৃত্রিমভাবে গ্রিনহাউজ গ্যাসের নিঃসরণ সেই পর্যায়ে নামিয়ে আনা।
* প্রতি ৫ বছর অন্তর ক্ষতিকর গ্যাস নিঃসরণ রোধে প্রতিটি দেশের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।
* জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে গরিব দেশগুলোকে ধনী দেশগুলোর 'জলবায়ু তহবিল' দিয়ে সাহায্য করা। প্রাথমিকভাবে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় চুক্তিটিতে।[২]

উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিটি স্বাক্ষর করার মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় ২০২০ সালের ৪ নভেম্বর চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসে। অবশ্য ২০২১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি দেশটি পুনরায় চুক্তিটিতে ফিরে আসে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মেয়াদ ছিল ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা (The Future We Want) নিয়ে ২০১৪ সালের ১৯ জুলাই জতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি

উন্নয়ন প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২০১৫ সালের ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) তৈরি হয়। যার দাপ্তরিক নাম 'Trasforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development', যাকে বলা হয় এসডিজির রূপরেখা।

এসডিজির ১৭টি উদ্দেশ্যের মধ্যে তিনটি উদ্দেশ্য সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত ছিল:

* অভীষ্ট ১৩-এ জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।
* অভীষ্ট ১৪-এ টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর, সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।
* অভীষ্ট ১৫-এ স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারের পৃষ্ঠপোষণ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়া মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।

পরিবেশবিষয়ক কনভেনশন

রামসার কনভেনশন: নদনদী, হাওড়-বিল, হ্রদ, পুকুরসহ বিভিন্ন ধরনের জলাশয় সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালে ইরানের রামসারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা রামসার কনভেনশন নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। চুক্তিটি ১৯৭৫ সালে কার্যকর হয়। বর্তমানে এ চুক্তির অধীনে বিশ্বের ১৭১টি দেশ গুরুত্বপূর্ণ জলাশয় সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে।

বাসেল কনভেনশন: এটি হলো বিপজ্জনক বর্জ্য দেশের সীমান্তের বাইরে চলাচল এবং এদের নিয়ন্ত্রণবিষয়ক কনভেনশন। সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরে ১৯৮৯ সালের ২২ মার্চ এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। তবে এটি কার্যকর হয় ১৯৯২-এর ৫ মে।

কপ-১৬: ষোড়শ জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন ২০১০ সালে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে 'সবুজ জলবায়ু' তহবিল গঠিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচনে এর মূলকেন্দ্র অবস্থিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তহবিলটি গঠিত হয়। শিল্পোন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে এই তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

ভিয়েনা কনভেনশন: এটিও জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক একটি চুক্তি। ১৯৮৫ সালের ২২ মার্চ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় চুক্তিটি গৃহীত হয় এবং কার্যকর হয় ১৯৮৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। তবে ইউএনইপির তথ্যমতে, এই চুক্তিটি বৈশ্বিক স্বীকৃতি লাভ করে ২০০৯ সালে। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো:

* ওজোন স্তরের সুরক্ষা ও সংরক্ষণবিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা।
* মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের ফলে ওজোন স্তরে ঘটিত ক্ষতিসংক্রান্ত গবেষণা ও তথ্য-উপাত্তগুলো জাতিগুলোর মাঝে আদান-প্রদান করা।[৩]

এ চুক্তির কলাকুশলীরা আশা করেন, ওজোন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে–এমন সব কার্যক্রম বন্ধে বিশ্বনেতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবেন। উল্লেখ্য, ভিয়েনা কনভেনশনকে আরও ফলপ্রসূ করতে তিন বছর পরপর স্বাক্ষরকারী দেশগুলো সম্মেলনে একত্রিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করে থাকে।

এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল:

* ২০৫০-২০৭০ সালের মধ্যে ওজোন স্তরকে যতদূর সম্ভব আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনা।
* পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অবস্থিত ওজোন স্তরের ক্ষয়কারী রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যেমন: HCFCs, CFCs, HFCs. মন্ট্রিল প্রটোকল এরকম প্রায় ৯৬টি ক্ষতিকারক উপাদানকে টার্গেট করে তাদের কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে।

কাগুজে চুক্তি ও তার বাস্তবায়ন

বাংলাদেশে প্রযোজ্য ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের (২জ) ধারায় চুক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আইনে বলবৎযোগ্য সম্মতি হচ্ছে চুক্তি। অঙ্গীকার পালনই চুক্তি আইনের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন চুক্তিতে স্বাক্ষরিত দেশগুলোর ভূমিকা লক্ষ করলে দেখা যায়, চুক্তি শুধু কাগজেই সীমাবদ্ধ, বাস্তবে নয়।

২০০৯ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চদশ জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন। সম্মেলনে 'Green Climate Fund' গঠনের অঙ্গীকার করা হয়। উন্নত দেশগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিবছর জলবায়ু পরিবর্তন ক্ষতিপূরণ তহবিলে ১০০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হবে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের, বছরে ৪০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু ২০২০ সালে দেশটি মাত্র ৭ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের গত বছরের এ হিসাবটি পাওয়া যাচ্ছে না। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা তাদের প্রতিশ্রুতি অর্থের মাত্র তিনভাগের একভাগ দিয়েছে। এদিকে যুক্তরাজ্য এখনো এক-তৃতীয়াংশ অর্থ ছাড় করেনি (প্রথম আলো, ৮ নভেম্বর ২০২২)। শীর্ষ কার্বন নিঃসরণকারী দেশ, কার্বন নিঃসরণ কম করেও ক্ষতির মুখে পড়া দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে অর্থ দেওয়ার লক্ষ্য ছিল, তা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

অন্যদিকে সুইজারল্যান্ডের গ্লাস্ড শহরে অনুষ্ঠিত কপ২৬ সম্মেলনে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল–২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন অর্ধেকে নামিয়ে আনা, যা অর্জন করতে হলে কার্বনের নির্গমন ৪৫ শতাংশ কমাতে হবে। আর ২০৫০ সালের মধ্যে নির্গমন কমিয়ে আনতে হবে শূন্য শতাংশে। কিন্তু জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাম্প্রতিক দশকে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে বৃদ্ধি পেতে পেতে বর্তমানে ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এসে ঠেকেছে। যার

পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বেড়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী গৃহীত পদক্ষেপ ও প্রয়াসগুলো বিশ্ববাসীর মনে আশার সঞ্চার করলেও নেতৃস্থানীয় কয়েকটি দেশের শিশুসুলভ আচরণ আশঙ্কার পারদ তুঙ্গে তুলে রাখছে হরহামেশাই। যেমন: যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে কিয়েটো প্রটোকল ও প্যারিস চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে বিশ্বব্যাপী একটি নেতিবাচক বার্তা দিয়েছে। একই কাজ করেছে উত্তর আমেরিকার শক্তিশালী দেশ কানাডাও। বড়ো দেশগুলোর এরকম আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক চুক্তিগুলোকে শুধু কাগুজে চুক্তির মর্যাদাই দিচ্ছে, এর বেশি কিছু নয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ ঝুঁকির তালিকায় থাকা শীর্ষ দেশগুলোর একটি। বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকির সূচক ২০২১ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের ক্ষতির তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির তালিকায় এর অবস্থান পঞ্চম। জার্মানওয়াচ সম্প্রতি এ তথ্য প্রকাশ করে। জাতিসংঘের একাধিক প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশের শিশু এই ঝুঁকির তালিকায় ১৫তম। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে আশঙ্কার দিক হলো সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি। WMO-এর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০৫০ সালে বাংলাদেশের ভূমির ১৭ শতাংশ এবং খাদ্য উৎপাদনের ৩০ শতাংশ হারিয়ে যাবে। Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-এর প্রক্ষেপণ অনুসারে, ২১০০ সালে বাংলাদেশে তাপমাত্রা ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বৃষ্টিপাত ৯.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (ADB) একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, উষ্ণায়নের বর্তমান ধারা ২০৫০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকলে দক্ষিণ এশিয়ায় শস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী গৃহীত পদক্ষেপ ও প্রয়াসগুলো বিশ্ববাসীর মনে আশার সঞ্চার করলেও নেতৃস্থানীয় কয়েকটি দেশের শিশুসুলভ আচরণ আশঙ্কার পারদ তুঙ্গে তুলে রাখছে হরহামেশাই

পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ

পরিবেশবিষয়ক সমস্যাগুলো সমাধান করে একটি পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (SDG) পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলার জন্য এবং BCC-SAP-2009-এ উল্লিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) গঠন করা হয়েছে ২০১০ সালে।

পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ অনুমোদন করা হয়েছে। ২০১৯ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বনজ সম্পদে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫) অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

পানিদূষণ রোধে তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে তরল বর্জ্য পরিশোধনব্যবস্থা Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ফলে অধিকাংশ পানিদূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে ইটিপি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইটিপি স্থাপনযোগ্য ২ হাজার ৪১৫টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ২ হাজার ৬৩টি ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে।

দীর্ঘ মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে UNFCC-এর আওতায় National Adaptation Plan প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে একটি Nap Road Map প্রণয়ন করা হয়েছে।

আখেরে যে কথাটি না বললেই নয়, আমাদের পৃথিবী আমাদেরই সুরক্ষিত রাখতে হবে। জ্ঞানবিজ্ঞান ও উন্নতি-সমৃদ্ধির এই সুসময়ে দাঁড়িয়ে সর্বাগ্রে 'বোধের উন্মেষ' ঘটাতে হবে। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র–প্রতিটি স্তরেই যদি পরিবেশ ও জলবায়ু সুরক্ষার বিষয়টি পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায়, তবেই পৃথিবী ও এর প্রাণিজগৎ আসন্ন দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে বলতে গেলে, বিশ্বনেতা ও বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলো যদি গৃহীত চুক্তিগুলো মান্য করতে আন্তরিক না হয় কিংবা দায়িত্বশীলতার পরিচয় না দেয়, তবে এত আয়োজন এত কল্যাণকর প্রয়াস–সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আর বাংলাদেশের মতো যেসব দেশ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের দিকে সব ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচ্চকার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব হওয়া উচিত।

তথ্যসূত্র

১. https://www.dcceew.gov.au/environment/protection/ozone/montreal-protocol#:~:text=The%20Montreal%20Protocol% 20on%20Substances,protect%20the%20earth's%20ozone%20layer.
২. বিবিসি।
৩. https://ozone.unep.org/treaties/vienna-convention (UNEP-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট)

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত

জাফর ওয়াজেদ

অভিঘাত তীব্র হয়ে উঠছে ক্রমাগত। বিপন্ন মানুষ; বিপন্ন জনপদ, বসতভিটা, জমিজমা। পরিবর্তিত আবহাওয়ার প্রকোপ বা কশাঘাতে মানবজীবন ধকলে। বদলে যাচ্ছে প্রকৃতির আদি অকৃত্রিম রূপ। বছর বছর আসে দুর্যোগ, আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের বসতভিটা, ঘরবাড়ি, সহায়সম্পদ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাস্তব রূপ যেন উপকূলীয় এলাকা। আগের তুলনায় উপকূলে এখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েছে কয়েক গুণ। বাড়ছে মানুষের বাস্তুচ্যুতিও।

জলবায়ু পরিবর্তনের ধকলে শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বকে ভুক্তভোগী হতে হচ্ছে। এটা তো বাস্তব–জলবায়ু পরিবর্তনের আঞ্চলিক প্রভাব প্রকৃতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। কতিপয় সাধারণ বৈশ্বিক পরিবর্তনের ফলাফল যেমন তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, যার ফলে স্থানীয় প্রভাব দেখা যায়, যেমন: বরফ গলানো। অন্যান্য ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট সমুদ্রের বর্তমান বা আবহাওয়াব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। গ্রিনহাউজ গ্যাস থেকে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা বহুবছর ধরে সমুদ্রের স্তর বাড়িয়ে তুলছে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় খুবই সাধারণ ঘটনা। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশের বসবাসের এই এলাকাগুলো ওইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়াও নদীবিধৌত বদ্বীপ বাংলাদেশ আরও প্রকৃতিক সংকটের মুখোমুখি হয়। তবে উষ্ণায়নের কারণে হিমালয়ের হিমবাহ গলতে থাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং প্রাণঘাতী দুর্যোগ-ঝুঁকি আরও বাড়ছে। এদেশের প্রধান প্রাকৃতিক বিপদ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা ও পানি বৃদ্ধি এবং মাটির লবণাক্ততা। অনেক সময় বন্যার কারণে নদীভাঙন হয়। আবার নদী ভেঙেও লোকালয় প্লাবিত হয়। ফলাফল প্রাণহানি, জমি ও সম্পত্তি বিনষ্ট এবং বহুমানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের

উপকূলীয় এলাকায় স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে দেখা হয়ে আসছে। এসব অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে ফি বছর। ক্ষয়ক্ষতি হয় অপরিসীম। এই যে গাঙ্গেয় বদ্বীপের দেশটি জলবায়ুর অভিঘাতে ঘনঘন দুর্যোগের মুখোমুখি হচ্ছে, আর ধ্বংসের গর্জন প্রকম্পিত হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেঁষে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, যা সংকটকে করছে আরও ঘনীভূত। সেই সঙ্গে সাগরপানির লবণাক্ততার প্রকোপ পড়ছে সর্বত্র। জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত জাতিসংঘের আন্তসরকার প্যানেল (আইপিসিসি) আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, একুশ শতকের মধ্যে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ এলকা ডুবে যেতে পারে। দেশের ১৯টি জেলার প্রায় ৬০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা ডুবে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। দুই কোটি মানুষ হবে গৃহহারা। ফলে এরা অন্যত্র অভিবাসী হয়ে যাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত ঝুঁকিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো দাবদাহ, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও উপকূলীয় এলাকায় বন্যা। এসব ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইউরোপ, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার বড়ো অংশে দাবদাহ ক্রমাগত বাড়ছে। একইভাবে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে ভারি বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বেড়েছে। একই সঙ্গে বিশ্বের নানা জায়গায় একই উদাহরণ তৈরি হচ্ছে। সময় স্পষ্ট করেছে যে, বিশেষ কোনো দেশ বা জনগোষ্ঠী নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের মুখে পড়ছে বিশ্বজুড়ে মানুষ। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত ২৫ বছরে এই প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ থেকে আমেরিকা মহাদেশেও। বিশ্বের অন্যান্য দেশে যেসব প্রভাব পড়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে, এর সবই বাংলাদেশেও ঘটতে শুরু করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশে অতিবৃষ্টি, অতি বন্যা, প্রচণ্ড খরার প্রকোপ বাড়ছে। বাড়ছে নিত্যনতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অসুখবিসুখ। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা। আর বাড়ছে শহরাঞ্চলে বস্তিবাসীর সংখ্যাও। জলবায়ুর ওপর মানুষের প্রভাব দেখা যায় উষ্ণায়নের পর্যবেক্ষণের ভৌগোলিক ধরনে, সমুদ্রের পরিবর্তে স্থল ও মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট ঝুঁকিগুলো শনাক্ত করেছে বাংলাদেশ সরকার। গত কয়েক বছরে সরকার দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই খাতে আর্থিক বরাদ্দ বেড়েছে। এই বিনিয়োগের সঙ্গে আরও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আর্থিক পরিকল্পনা, তদারকি, রিপোর্টিং ও কার্যকর নীতি রাখা দরকার। তবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণের যোগসূত্র পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি এখনো।

মিশরের শার্ম আল-শেখে অনুষ্ঠিত জালবায়ু সম্মেলন তথা কনফারেন্স অব পার্টিজ ২৭ বা কপ২৭-এ অংশ নিয়েছে ১৯৮টি দেশের প্রায় ৩০ হাজার মানুষসহ জাতিসংঘ, পরিবেশকর্মী ও সরকারি কর্মকর্তারাও। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় থাকা দেশের মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। কিন্তু তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার দিক থেকে বাংলাদেশের হয়তো বেশি কিছু করার নেই। কারণ, সমস্যাটা তো বৈশ্বিক। সেটা সমাধানের জন্য উন্নত দেশগুলোর দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে।

সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দরিদ্র দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছে ধনী দেশগুলো। বাংলাদেশ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিলিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় তৈরি করেছে। তথাপি পরিবেশবিদদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ৬৫ লাখ মানুষ বাস্তুহারা হয়েছে। যেভাবে উষ্ণতা বাড়ছে, তাতে আগামী কয়েক বছরে তিন থেকে চার কোটি মানুষ বাস্তুহারা হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-চীনের মতো দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ না কমালে, পদক্ষেপ না নিলে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এমনিতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য যত কার্বন নিঃসরণ হয়, সেখানে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর দায় খুবই সমান্য। বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জ বাড়ছে। এদেশে দুর্যোগ বেশি হচ্ছে, নদীভাঙন বাড়ছে, বেশি বেশি ঝড়-বন্যা হচ্ছে; সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গে শুষ্কতা তৈরি হচ্ছে আর দক্ষিণবঙ্গে লবণাক্ততা বাড়ছে। এসব কিছুই হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। যে কারণে ১৯৯১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ১৯৭টি বড়ো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বাংলাদেশে বছরে প্রায় শতকোটি ডলারের সমপরিমাণ ক্ষতি হয়, আর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে ১ কোটি ৩৩ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত হতে পারে। দুর্যোগে, নদীভাঙনে ছিন্নমূল মানুষ সর্বহারা হয়ে পাড়ি দেয় ভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য ও কাজের সন্ধানে। এভাবে নিজ দেশে অভিবাসী হয়ে বেঁচে থাকার বিকল নেই। এ কারণেই সংকট মোকাবিলায় তহবিল বরাদ্দ এবং সেটার ব্যয়ের ওপর জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এখন সবচেয়ে বড়ো–বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ধরে রাখা। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, একুশ শতকে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির বেশি বাড়লে বিশ্বে মারাত্মক খাদ্যঘাটতি দেখা দেবে। এখনো সেই কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ধরে রাখার মতো অবস্থায় নেই। বিশেষ করে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিও নেই। জাতিসংঘের মহাসচিবও বলেছেন, রিপোর্টের পর রিপোর্টে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি পরিষ্কার ও অন্ধকার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

> জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট ঝুঁকিগুলো শনাক্ত করেছে বাংলাদেশ সরকার। গত কয়েক বছরে সরকার দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই খাতে আর্থিক বরাদ্দ বেড়েছে

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ধকল বাংলাদেশকে পোহাতে হচ্ছে। যে কারণে বারবার ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙনের কারণে মানুষের দুর্দশা বাড়ছে। ফসলি জমি, বসতভিটা–সবই নদীর স্রোতে ভেসে গেছে। বছর বছর দুর্যোগ আসে, আর সর্বস্বান্ত হয় মানুষ। জলবায়ুর অভিঘাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত পদক্ষেপ। সাগরের অতলে ডুবে যাওয়ার যে আশঙ্কা, তা দূরীভূত করার পদক্ষেপ নেওয়ার সময় ফুরিয়ে আসছে–তার আগে যেতে হবে বহুদূর। পাড়ি দিতে হবে আরও অনেক পথ।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) মিলনায়তনে সাংবাদিকদের মাঝে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের কল্যাণ অনুদান ও করোনাকালীন দ্বিতীয় পর্যায়ের সহায়তা চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সঙ্গে প্রয়োজন দায়িত্বশীলতা: তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যেমন দরকার, তেমনই দায়িত্বশীলতাও প্রয়োজন। ৫ জুলাই রাজধানীর সার্কিট হাউজ রোডে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) মিলনায়তনে সাংবাদিকদের মাঝে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের কল্যাণ অনুদান ও করোনাকালীন দ্বিতীয় পর্যায়ের সহায়তা চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, আমাদের দেশে অপসাংবাদিকতার জন্য প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় না। যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেশনের জন্য প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়, জরিমানা দিতে হয়। তিনি বলেন, সমালোচনা থাকবে; দায়িত্বে থাকলে সমালোচনা হবেই। কিন্তু সমালোচনা যেন বস্তুনিষ্ঠ হয়। ড. হাছান বলেন, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট সাংবাদিকসমাজের ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে। ট্রাস্ট থেকে সহায়তায় সবাইকে বিবেচনা করা হয়। যে সাংবাদিক নিয়মিত সরকারের বিরুদ্ধে লেখেন, এমনকি সরকার পতনের জন্য বক্তৃতা দেন, তাদেরও আমরা এই সহায়তা দিয়েছি এবং দিচ্ছি।

ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুভাষ চন্দ বাদলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ওমর ফারুক, ডিইউজে'র সাবেক সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, দৈনিক সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাশেম হুমায়ূন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেনসহ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা বক্তব্য দেন। পরে সাংবাদিকদের মাঝে চেক বিতরণ করেন মন্ত্রী ও অতিথিরা। (সূত্র: ৬ জুলাই ২০২২, সমকাল)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধের বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাংবাদিক নেতরা

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে সাংবাদিক নেতাদের শ্রদ্ধা

জাতীয় প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে ৬ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধের বেদিতে ফুল দিয়ে শোকাবহ আগস্টের শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে নেতারা ফাতেহাপাঠ এবং বঙ্গবন্ধুসহ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মোনাজাত করেন। এ সময় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মাঈনুল আলম, কোষাধ্যক্ষ শাহেদ চৌধুরীসহ প্রেস ক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবদিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধের বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ সময় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার এমডি আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ওমর ফারুক, মহাসচিব দ্বীপ আজাদ, সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল, যুগান্তর সম্পাদক সাইফুল আলম, শাহজাহান মিয়া, আব্দুল জলিল ভুঁইয়া, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহসভাপতি ড. উৎপল সরকার, দপ্তর সম্পাদক সেবীকা রানী, সদস্য নূর-এ-জান্নাত সীমাসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বাসসের এমডি আবুল কালাম আজাদ বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক নেতাদের সঙ্গে নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধের বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেনের নেতৃত্বে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতারা বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শোক দিবেসের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একই সময় ঢাকা সাংবাদিক পরিবার বহুমুখী সমবায় সমিতির সভাপতি মো. আল-মামুন ও সাধারণ সম্পাদক মো. মফিজুর রহমান খান বাবুর নেতৃত্বে সমিতির নেতারা বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এছাড়া বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র, কুমিল্লা সাংবাদিক ফোরাম, বৃহত্তর ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর সাংবাদিক ফোরামের পক্ষ থেকে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধের বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। (সূত্র: ৭ আগস্ট ২০২২, দৈনিক ইত্তেফাক)

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা চাইলেন জবি উপাচার্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক বলেছেন, 'যেটা সত্য, সেটা প্রকাশ করতে হবে। অন্যায়-দুর্নীতি হলে অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। না হলে দুর্নীতি রোধ করা যাবে না। এজন্য আমরা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা চাই।'

২০ জুন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এদিন সংগঠনটির কার্যালয়ে উপাচার্য কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মো. ওহিদুজ্জান, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোস্তফা কামাল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক ও সমকালের সিনিয়র রিপোর্টার আতাউর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এসএম মহসিন, সাবেক সভাপতি সুলায়মান সালমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহবুব মমতাজী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। (সূত্র: ২১ জুন ২০২২, কালের কণ্ঠ)

ইমদাদুল হক মিলন কালের কণ্ঠের প্রধান সম্পাদক

পাঠকপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক ইমদাদুল হক মিলন দেশের প্রথম সারির জাতীয় দৈনিক কালের কণ্ঠের প্রধান সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। ২৩ নভেম্বর ইস্ট

ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের উপদেষ্টা (প্রেস ও মিডিয়া) আবু তৈয়ব স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

'নূরজাহান' উপন্যাসের মাধ্যমে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করা এই লেখক এর আগে টানা প্রায় ১০ বছর পত্রিকাটির সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। গত বছরের ৩ অক্টোবর তিনি ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের (ইডব্লিউএমজিএল) পরিচালক নির্বাচিত হন। এক বছর পর ফিরলেন নতুন পরিচয়ে।

নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর ইমদাদুল হক মিলন বলেন, 'দেশের অন্যতম শক্তিশালী গণমাধ্যম কালের কণ্ঠকে আরও এগিয়ে নিতে সব কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ করব, যাতে পাঠকের আস্থা ও ভরসার জায়গা হিসাবে পত্রিকাটি আরও পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে।' (সূত্র: ২৪ নভেম্বর ২০২২, কালের কণ্ঠ)

ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত সমকাল ও চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সাংবাদিকদের সঙ্গে টাইমস মিডিয়া লিমিটেডের এমডি এ কে আজাদ

ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড ২০২২-এ বিজয়ী সমকাল ও চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সাংবাদিকদের ফুলেল অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠান দুটির উদ্যোক্তা এ কে আজাদ। পুরস্কারপ্রাপ্তিতে ৪ নভেম্বর তেজগাঁওয়ের টাইমস মিডিয়া ভবন মিলনায়তনে এক আনন্দ অনুষ্ঠানে সাহসী ও সৎ সাংবাদিকতায় সমকাল ও চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সাংবাদিকদের অনুপ্রাণিত করেন তিনি।

চলতি বছরে ডিআরইউ-এর বেস্ট রিপোর্টিং প্রতিযোগিতায় সংবাদপত্র বিভাগে তিনটি পুরস্কারের দুটিই পেয়েছে সমকাল। প্রথম হয়েছেন সমকালের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক রাজীব আহাম্মদ; তৃতীয় হয়েছেন বিশেষ প্রতিনিধি ওবায়দুল্লাহ রনি। সব সংবাদমাধ্যমের জন্য উন্মুক্ত মুক্তিযুদ্ধ বিভাগের পুরস্কার পেয়েছেন সমকালের সাবেক বিশেষ প্রতিনিধি রাজীব নূর। টেলিভিশন বিভাগে চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মুকিমুল আহসান হিমেল প্রথম হয়েছেন।

সমকাল ও চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান টাইমস মিডিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ বিজয়ীদের হাতে ফুল তুলে দিয়ে বলেছেন, সাহসী ও সৎ সাংবাদিকতা অব্যাহত রাখলে ভবিষ্যতে আরও পুরস্কার আসবে। সমকাল ও চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সাংবাদিক ও কর্মীদের ভালো সাংবাদিকতায় অনুপ্রাণিত করতে বার্ষিক পুরস্কারের ঘোষণা দেন তিনি। (সূত্র: ৫ নভেম্বর ২০২২, সমকাল)

ব্র্যাকের পুরস্কার পেলেন ১৬ সাংবাদিক

অভিবাসন খাতের সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য ব্র্যাকের মাইগ্রেশন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ১৬ সাংবাদিক। ২৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টারে অনুষ্ঠানে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ।

অভিবাসন খাতে সাংবাদিকতাকে স্বীকৃতি দিতে ২০১৫ সাল থেকে পুরস্কার দিচ্ছে ব্র্যাকের অভিবাসন কর্মসূচি। এ বছর সপ্তমবারের মতো এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের ডেনমার্ক দূতাবাসের সহযোগিতায়। এতে জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন সমকালের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক রাজীব আহাম্মদ। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মানসুরা হোসাইন। যুগ্মভাবে তৃতীয় সেরা পুরস্কার পেয়েছেন দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের আরাফাত আরা ও আজকের পত্রিকার শাহরিয়ার হাসান।

সংবাদপত্র আঞ্চলিক বিভাগের দৈনিক চট্টগ্রাম খবরের ফারুক মুনীর, একুশে পত্রিকার শরীফুল ইসলাম এবং সাপ্তাহিক চৌদ্দগ্রামের এমদাদ উল্যাহ পুরস্কার পেয়েছেন। টেলিভিশন বিভাগের ডিবিসি নিউজের সাবিনা ইয়াসমিন, সময় টিভির মারজিয়া মুমু এবং নিউজ টোয়েন্টিফোরের মাসুদা খাতুন পুরস্কৃত হয়েছেন। টেলিভিশন প্রোগ্রাম বিভাগের চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের মোরশেদ হাসিব হাসান পুরস্কার লাভ করেছেন। রেডিয়ো বিভাগের পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশ বেতারের মোস্তাফিজুর রজমান। অনলাইন সংবাদ বিভাগের জাগো নিউজের জাহাঙ্গীর আলম, প্রথম আলোর মহিউদ্দিন নিলয় এবং যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন দৈনিক বাংলার জেসমিন পাপড়ি ও প্রবাসী সাংবাদিক রাকিব হাসান। তাদের ক্রেস্ট, সনদ ও অর্থমূল্যের চেক দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে।

প্রবাসীদের কল্যাণে সরকারের নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইমরান আহমদ বলেন, বার্ষিক রেমিট্যান্স জাতীয় বাজেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। রেমিট্যান্স আহরণে ব্যর্থ হলে বাজেট ব্যর্থ হবে। অভিবাসীদের অধিকার রক্ষা ও সঠিক তথ্য প্রদানে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। (সূত্র: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২, সমকাল)

প্রথম আলোর দুই পুরস্কার

সংবাদমাধ্যমে পাঠকদের যুক্ত করা, প্রচারণায় সৃজনশীলতা আর উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক কৌশলে প্রথম আলোর ছাপা পত্রিকা ও ডিজিটালের দুটি উদ্যোগ নিয়ে এলো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। সংবাদমাধ্যমের অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল নিউজ মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (ইনমা) আয়োজিত 'গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস ২০২২'-এ 'বেস্ট ইউজ অব প্রিন্ট' ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান এবং 'বেস্ট আইডিয়া টু গ্রো অ্যাডভারটাইজিং সেলস' ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে প্রথম আলো। বিশ্বের পত্রিকা, টেলিভিশন, রেডিয়োসহ সংবাদমাধ্যমের জন্য সম্মানজনক এই পুরস্কারের আসরে প্রথমবারের মতো 'শীর্ষ পুরস্কার' পেল বাংলাদেশি কোনো সংবাদমাধ্যম। ৯ জুন ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়।

এছাড়া বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ভিডিয়ো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফরম চরকি 'বেস্ট ইনিশিয়েটিভ টু অ্যাকুয়ার সাবস্ক্রাইবার' ক্যাটাগরিতে সম্মানজনক স্বীকৃতি পেয়েছে।

গত বছর 'গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস ২০২১'-এ কোনো বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রথমবারের মতো সম্মানজনক স্বীকৃতি পায় প্রথম আলো। এ বছর সর্বোচ্চ ৪৬টি দেশের ২৫২টি সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, ডিজিটাল মিডিয়া, টেলিভিশন ও রেডিয়ো থেকে ৮৫৪টি উদ্যোগ আবেদন করে গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডসের জন্য। গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডের সহযোগী গুগল নিউজ ইনিশিয়েটিভ।

২০২১ সালে ছাপা পত্রিকায় নানামুখী সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ, তথ্য উপস্থাপন ও বিজ্ঞাপনের নতুনত্বের জন্য ন্যাশনাল ব্র্যান্ড বিভাগে 'বেস্ট ইউজ অব প্রিন্ট' ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পায় প্রথম আলো। এই ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে যথাক্রমে ক্রোয়েশিয়ার গ্লোরিয়া গ্ল্যাম এবং আয়ারল্যান্ডের আইরিশ এক্সামিনার। এ ক্যাটাগরিতে সম্মানজনক স্বীকৃতি পেয়েছে আরব আমিরাতের আরব নিউজ, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক টাইমস এবং কানাডার টরস্টার।

গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডসে বেস্ট আইডিয়া টু গ্রো অ্যাডভারটাইজিং সেলস ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে প্রথম আলো ডিজিটালের 'ঘরে বসে ঘর খুঁজুন' প্রকল্পটি। এই ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পায় ক্রোয়েশিয়ার হানজা মিডিয়া এবং তৃতীয় পুরস্কার পায় ভারতের হিন্দুস্তান টাইমস। এ বিভাগে সম্মানজনক স্বীকৃতি পায় ভারতের দ্য হিন্দু, বেনেট কোলম্যান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড (টাইমস অব ইন্ডিয়া) এবং জাগরণ প্রকাশন।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে সংবাদমাধ্যমের আন্তর্জাতিক আরেক সংগঠন ওয়ান-ইফরা আয়োজিত সাউথ এশিয়ান ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডে দুটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পায় প্রথম আলো। ২০২০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ভারতের দিল্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রথম আলো একটি সোনা ও একটি ব্রোঞ্জপদক পায়। (সূত্র: ১৬ জুন ২০২২, প্রথম আলো)

লতিফুর রহমান পুরস্কার পেলেন সাংবাদিক সোহরাব হাসান

প্রথম আলোর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মিডিয়াস্টার লিমিটেড ও ট্রান্সকম গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের নামে চালু করা বর্ষসেরা সাংবাদিকতার পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আলোর যুগ্মসম্পাদক সোহরাব হাসান। প্রথম আলোর ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১২ নভেম্বর রাজধানীর পাঁচতারকা র‍্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে আয়োজিত প্রীতি সম্মিলনীতে সোহরাব হাসানের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার হিসাবে পাঁচ লাখ টাকা ও ক্রেস্ট দেওয়া হয়। সোহরাব হাসানের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রথম আলোর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মিডিয়াস্টার লিমিটেড ও ট্রান্সকম গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সিমিন রহমান। এ সময় প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

অতিথিদের সঙ্গে অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার পাওয়া শিক্ষার্থীরা

ট্রান্সকম গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের নামে গত বছর এই পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার এ পুরস্কার দেওয়া হলো। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সোহরাব হাসান এই পুরস্কার সহকর্মী, বন্ধু ও প্রথম আলো সম্পাদককে উৎসর্গ করেন। তিনি বলেন, 'পুরস্কার পাওয়া সব সময়ই ভালো লাগে। আজও ভালো লাগছে। তবে আরও ভালো লাগার কারণ হলো এই পুরস্কার এমন এক ব্যক্তির নামে, যিনি ব্যাবসাকে সততার প্রতীকে পরিণত করেছেন।' (সূত্র: ১৩ নভেম্বর ২০২২, প্রথম আলো)

অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার পেলেন ঢাবির ১১ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০২০ সালের বিএসএস (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফল করায় ১১ জন শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে।

২০ সেপ্টেম্বর ঢাবির অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন ইশরাক সাব্বির নির্ঝর, অরিন আহমেদ মিতু, ইশরাত জাহান প্রমি, জোবায়ের আহমেদ, কৌশিক এইচ হায়দার, মীর সাদ্দাম হোসেন, মো. মুজাহিদুল ইসলাম, আবু নোমায়ের সাদ, তাসনোভা আরেফিন, জান্নাতুল নাঈম পিয়াল ও তামারা ইয়াসমিন তমা।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য দেন। অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহকারী অধ্যাপক মার্জিয়া রহমান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত অধ্যাপক সিতারা পারভীনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন একজন সৎ, আদর্শবান ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক।

অধ্যাপক সিতারা পারভীনের আদর্শ ধারণ করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে উপাচার্য বলেন, একাডেমিক সফলতার সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে হবে।

উল্লেখ্য, সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কন্যা এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী অধ্যাপক ড. সিতারা পারভীন ২০০৫ সালের ২৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। (সূত্র: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২, সমকাল)

প্রথম আলোয় পাঁচ পুরস্কার বিএসপিএ-এর বর্ষসেরা সাংবাদিক

বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির বর্ষসেরা ক্রীড়া সাংবাদিক পুরস্কারে বিভিন্ন বিভাগে জয়ী হয়েছেন প্রথম আলোর পাঁচজন। পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আলোর হেড অব স্পোর্টস তারেক মাহমুদ, বিশেষ প্রতিনিধি মাসুদ আলম, বিশেষ ফটোসাংবাদিক শামসুল

হক, জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক বদিউজ্জামান ও সাবেক নিজস্ব প্রতিবেদক রাশেদুল ইসলাম। ফিচার বিভাগে (পত্রিকা, অনলাইন, ম্যাগাজিন) চ্যাম্পিয়ন মাসুদ আলম। এ বিভাগের রানারআপ বদিউজ্জামান ও রাশেদুল ইসলাম। সাক্ষাৎকার (পত্রিকা, অনলাইন, ম্যাগাজিন) ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন রাহেনুর ইসলাম, রানারআপ তারেক মাহমুদ ও ঢাকা পোস্টের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আরাফাত জোবায়ের। ফটোগ্রাফি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন নিউ এজের নিজস্ব ফটোসাংবাদিক সৌরভ লস্কর, রানারআপ প্রথম আলোর বিশেষ ফটোসাংবাদিক শামসুল হক ও কালের কণ্ঠের বিশেষ ফটোসাংবাদিক মীর ফরিদ। (সূত্র: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২, প্রথম আলো)

সাউথ এশিয়ান ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পেলেন ফারুকী

শিকাগো সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ১৩তম আসরে পুরস্কৃত হয়েছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে খবরটি নিজেই জানিয়েছেন নির্মাতা। এক স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, 'শিকাগো সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালকে ধন্যবাদ আমাকে এ বছরের সাউথ এশিয়ান ফিল্ম পুরস্কার দেওয়ার জন্য। জেনে ভালো লাগছে যে অতীতে এই পুরস্কার আমার পছন্দের মানুষেরা অর্জন করেছিলেন। সম্মানিত বোধ করছি। মনে হচ্ছে আমার যাত্রা কেবল শুরু, যেতে হবে আরও অনেক দূর।' ২২-২৫ সেপ্টেম্বর চলে শিকাগো সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এবারের উৎসবে পূর্ণদৈর্ঘ্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য ও তথ্যচিত্র মিলিয়ে ৮০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। (সূত্র: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২, কালের কণ্ঠ)

বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৯ সাংবাদিক ডিজিটাল বাংলাদেশবিষয়ক প্রতিবেদন

সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং অনলাইনে প্রকাশিত ডিজিটাল বাংলাদেশবিষয়ক প্রতিবেদনের জন্য ৯ সাংবাদিককে 'বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড' দিয়েছে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। ৩০ জুলাই রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পর্যটন ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী

পুরস্কারপ্রাপ্ত কয়েক জনের সঙ্গে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক

জুনাইদ আহমেদ পলক। বিভাগের সচিব এনএম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিচারকমণ্ডলীর সদস্য ও ডিবিসি টেলিভিশনের সম্পাদক জায়েদুল আহসান পিন্টু, প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব হাসান জাহিদ তুষার এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ।

নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং আইসিটি বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেশের বেশ কয়েকটি জেলা সফর করেন প্রায় ১০০ সাংবাদিক। এ সফরে ডিজিটাল বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থাপনা এবং তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়ায় তৃণমূলের মানুষের জীবনের বদলে যাওয়ার গল্প সরেজমিনে দেখানো হয়। এ সফরকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত রিপোর্ট বিচার করে ৯ জনকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে পাঁচ বিচারকের প্যানেল।

সংবাদপত্র ও অনলাইন ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছেন দৈনিক দেশ রূপান্তরের প্রধান প্রতিবেদক উম্মুল ওয়ারা সুইটি, দ্বিতীয় দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র রিপোর্টার সমীর কুমার দে, তৃতীয় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার স্টাফ রিপোর্টার সৈয়দ এলতেফাত হোসাইন, চতুর্থ ঢাকা পোস্টের সিনিয়র রিপোর্টার আবু সালেহ সাদাত এবং পঞ্চম হয়েছেন দৈনিক সমকালের বিশেষ প্রতিনিধি রাশেদ মেহেদী। টেলিভিশন ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছেন একাত্তর টিভির সিনিয়র রিপোর্টার শেখ রাকিবুল হাসান, দ্বিতীয় বাংলাদেশ টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার কুমার বিশ্বজিত রায়, তৃতীয় চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের স্টাফ রিপোর্টার মুরসালিন জুনায়েদ এবং চতুর্থ হয়েছেন বাংলাভিশনের স্টাফ রিপোর্টার শিহাব হোসাইন। বিজয়ীদের ক্রেস্ট এবং ল্যাপটপ পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিকনির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তব। (সূত্র: ১ আগস্ট ২০২২, দৈনিক ইত্তেফাক)

এফএফবি-ইরি ফেলোশিপ পেলেন ১০ সাংবাদিক

ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইরি) ও ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশ (এফএফবি) প্রবর্তিত মিডিয়া ফেলোশিপ পেয়েছেন সমকালের জাহিদুর রহমানসহ ১০ সাংবাদিক। ২৫ আগস্ট রাজধানীর ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্টস ফোরাম মিলনায়তনে 'এফএফবি-ইরি মিডিয়া ফেলোশিপ'-এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করা হয়।

ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশ'র নির্বাহী পরিচালক মো. আরিফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক কৃষি সচিব আনোয়ার ফারুক। অন্যদের মধ্যে ছিলেন ইরির কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ হুমনাথ ভান্ডারী, কনসালট্যান্ট আহমেদ সালাউদ্দিন, ইরির প্রধান কার্যালয়ের সিনিয়র ম্যানেজার মার্টিন পেকার এবং বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইদ শাহীন। (সূত্র: ২৬ আগস্ট ২০২২, সমকাল)

মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১১ সাংবাদিক

বাংলাদেশে শিশু অধিকার নিয়ে কাজের স্বীকৃতি হিসাবে ১১ সাংবাদিক পেয়েছেন

ইউনিসেফ প্রবর্তিত মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস ২০২২। ৬ ডিসেম্বর ঢাকার একটি হোটেলে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রায় ৩০০ প্রতিবেদন থেকে এবার ৫১ জন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন বিডিনিউজের হিমু চন্দ্র শীল, নিউজ বাংলার জেসমিন আক্তার পাপড়ি, ঢাকা ট্রিবিউনের নওয়াজ ফারহিন অন্তরা, কালের কণ্ঠের এমরান হাসান সোহেল, ঢাকা পোস্টের তানভীরুল ইসলাম ও নাগরিক টিভির শাহনাজ শারমিন। ফটোসাংবাদিকতায় পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আলোর মো. সাজিদ হোসেন ও জাহিদুল করিম। এছাড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশু সাংবাদিক হলেন জাগো নিউজ ২৪-এর মোহাম্মদ মোশারফ হোসাইন, এটিএন বাংলার খালিদুল ইসলাম তানভির এবং হ্যালো.বিডিনিউজ২৪.কম-এর ধী অরণী পাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন, বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি শেলডন ইয়েট এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা ও পাঠশালা ইনস্টিটিউটের প্রভাষক শামীম আখতার। ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম পুরস্কারে মনোনীতদের জন্য একটি ভিডিয়ো বার্তা পাঠান। অনুষ্ঠানে বিচারকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক গীতিআরা নাসরিন, আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা এএফপির ব্যুরোপ্রধান শফিকুল আলম, রয়টার্সের প্রধান প্রতিবেদক রুমা পাল, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকার আলোকচিত্রী ও প্রশিক্ষক আবি আবদুল্লাহ। (সূত্র: ৭ ডিসেম্বর ২০২২, সমকাল)

পুলিৎজার পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফাহমিদা আজিম

সাংবাদিকতা ও প্রকাশনার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন চিত্রশিল্পী এবং অলংকরণশিল্পী ফাহমিদা আজিম। তিনিই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রথম আমেরিকান, যিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন। ২০২১ সালের ২৮ ডিসেম্বর ইনসাইডার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত 'হাউ আই এস্কেপড আ চাইনিজ ইন্টার্নমেন্ট ক্যাম্প' শিরোনামের একটি সচিত্র প্রতিবেদনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অনলাইন সংবাদমাধ্যম ইনসাইডারের টিমকে পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। ইলাস্ট্রেটেড রিপোর্টিং অ্যান্ড কমেন্টারির জন্য পুলিৎজার বিজয়ী দলের সদস্য হিসাবে ফাহমিদা পুরস্কার পেয়েছেন। ফাহমিদা ছাড়াও বিজয়ী দলে অ্যান্থনি ডেল কোল, জোশ অ্যাডামস ও নিউ ইয়র্কের ইনসাইডারের ওয়ান্ট হিকি রয়েছেন বলে পুলিৎজার কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে 'সাি-মরা সুফি' বইয়ে ইলাস্ট্রেশনের জন্য 'গোল্ডেন কাইট' পুরস্কার পান ফাহমিদা। পুলিৎজার পুরস্কারের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ফাহমিদা আজিমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ফাহমিদা আজিম একজন চিত্রশিল্পী ও গল্পকার। তার কাজ মূলত পরিচয়, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা নিয়ে। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, এনপিআর, গ্ল্যামার, সায়েন্টিফিক আমেরিকান, দি ইন্টারসেপ্ট ও ডাইসসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করেছেন ফাহমিদা। বর্তমানে ওয়াশিংটনের সিয়াটলে বসবাস করছেন তিনি। এর আগে ২০১৮ সালে রয়টার্সের পিচ ফটোসাংবাদিকের সঙ্গে পুলিৎজার জেতেন বাংলাদেশি আলোকচিত্রী পনির হোসেন। (সূত্র: ২৪ আগস্ট ২০২২, দৈনিক ইত্তেফাক)

ডিআরইউ নির্বাচন

সভাপতি নোমানী, সাধারণ সম্পাদক সোহেল

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নির্বাচনে সভাপতি পদে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার মুরসালীন নোমানী এবং সাধারণ সম্পাদক ইনকিলাবের মাইনুল আহসান সোহেল বিজয়ী হয়েছেন ৩০ নভেম্বর ভোটগ্রহণ শেষে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। রাজধানীর সেগুনবাগিচার ডিআরইউ কার্যালয়ে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলে। ১ হাজার ৭৪৪ জন ভোটারের মধ্যে ১ হাজার ৪৫৭ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

নির্বাচনে অন্যান্য পদে বিজয়ীরা হলেন সহসভাপতি দীপু সারোয়ার, যুগ্মসম্পাদক মঈনুল আহসান, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সুমন, দপ্তর সম্পাদক কাওসার আজম, নারীবিষয়ক সম্পাদক মরিয়ম মনি সেঁজুতি, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কামাল উদ্দিন সুমন, তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন রুবেল, ক্রীড়া সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিজান চৌধুরী এবং কল্যাণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ। আপ্যায়ন সম্পাদক পদে মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়া সদস্য পদে মনিরুল ইসলাম মিল্লাত মনির মিল্লাত, ইসমাঈল হোসাইন রাসেল, মহসিন বেপারী, মোজাম্মেল হক তুহিন, কিরণ সেখ, এসএম মোস্তাফিজুর রহমান সুমন এবং আলী ইব্রাহিম নির্বাচিত হয়েছেন। (সূত্র: ১ ডিসেম্বর ২০২২, সমকাল)

বাচসাসের সভাপতি ফাল্গুনী সাধারণ সম্পাদক শপথ

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির (বাচসাস) নির্বাচনে ফাল্গুনী হামিদ পুনরায় সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শপথ চৌধুরী।

১৪ আগস্ট সিনিয়র সাংবাদিক ও বাচসাসের প্রধান নির্বাচন কমিশনার রফিকুজ্জামান চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেন। অন্য কোনো বৈধ প্রার্থী না থাকায় ফাল্গুনী হামিদ ও শপথ চৌধুরীর প্যানেলকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করে বাচসাস নির্বাচনের পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন বোর্ড।

আগামী দুই বছরের জন্য নির্বাচিত অন্যরা হলেন সিনিয়র সহসভাপতি আবিদা

নাসরিন কলি, সহসভাপতি সৈকত সালাউদ্দিন, সহসাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মইনুল হক রোজ, অর্থ সম্পাদক মইন আব্দুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক লিমন আহমেদ, আন্তর্জাতিক ও গবেষণা সম্পাদক জনি হক, ক্রীড়া সম্পাদক মাহমুদ মানজুর, সমাজকল্যাণ ও মহিলাবিষয়ক সম্পাদক শ্রাবণী রাখি, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মীর সামী এবং দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া।

কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন ইব্রাহিম খলিল খোকন, তুষার আদিত্য, রেজাউল করিম রেজা, এমএস রানা, শফিক আল মামুন, দাউদ হোসাইন রনি, আল কাছির ভুইয়া, এটিএম মাকসুদুল হক ও কামরুজ্জামান বাবু। (সূত্র: ১৬ আগস্ট ২০২২, কালের কণ্ঠ)

পার্লামেন্ট জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন হারুন সভাপতি নাফিজা সম্পাদক

বাংলাদেশ পার্লামেন্ট জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিজেএ) দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে দৈনিক বাংলার বিশেষ প্রতিনিধি হারুন আল রশীদ সভাপতি এবং ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি নাফিজা দৌলা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ২ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তারা নির্বাচিত হন। দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়। পরে ভোট গণনা শেষে সন্ধ্যায় নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচিত অন্যরা হলেন সহসভাপতি সমকালের বিশেষ প্রতিনিধি মসিউর রহমান খান (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়), যুগ্মসাধারণ সম্পাদক বিডিনিউজের কাজী সাজিদুল হক, অর্থ সম্পাদক জাগো নিউজের সিরাজুজ্জামান হেলাল এবং দপ্তর সম্পাদক বণিক বার্তার জেসমিন মলি।

এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন সারাবাংলার আজমল হক হেলাল, বাংলা ট্রিবিউনের এমরান হোসাইন শেখ, দৈনিক ইত্তেফাকের শামসুদ্দিন আহমেদ, ইউএনবির মুহম্মদ সাইফুল্লাহ এবং আলোকিত বাংলাদেশের মিজান রহমান।

নির্বাচনে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের পরিচালক তারিক মাহমুদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সহকারী পরিচালক নুরুল আবছার ও জ্যোতির্ময় গোলদার নির্বাচন কমিশনার এবং সহকারী পরিচালক তানজিনা তানিন নির্বাচন কমিশন সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচনের আগে সকালে বিপিজেএ-এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের বিদায়ি সভাপতি উত্তম চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে ও বিদায়ি সাধারণ সম্পাদক কামরান রেজা চৌধুরীর সঞ্চালনায় সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু। আরও বক্তব্য দেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি শাহজাহান সরদার, সাবেক সভাপতি আশিস সৈকত ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজওয়ানুল হক রাজা। (সূত্র: ৩ সেপ্টেম্বর ২০২২, সমকাল)

৮১ বছর পর বন্ধ হচ্ছে বিবিসি বাংলা রেডিয়োর সম্প্রচার

দীর্ঘ ৮১ বছর পর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিবিসি বাংলা রেডিয়ো। এর মধ্য দিয়ে অবসান ঘটবে একটি যুগের। ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য বাংলাসহ বিশ্বের মোট ১০টি ভাষায় রেডিয়ো সম্প্রচার বন্ধ করছে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (বিবিসি)।

বন্ধ হতে যাওয়া অন্য ৯ ভাষা হচ্ছে আরবি, ফারসি, চীনা, কিরগিজ, উজবেক, হিন্দি, ইন্দোনেশীয়, তামিল ও উর্দু।

বিবিসি কর্তৃপক্ষ বলেছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির চাপে 'এই কঠিন সিদ্ধান্ত' নিচ্ছে তারা। তারা আরও জানায়, ওয়ার্ল্ড সার্ভিসকে আরও আধুনিক ও ডিজিটাল রূপদানে এই পরিকল্পনা সহায়তা করবে।

অন্যদিকে বিবিসি বাংলা অনলাইনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোনো ভাষা বিভাগই পুরোপুরি বন্ধ করা হচ্ছে না। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি অনলাইনে কার্যক্রম চালাবে।

বিবিসি বাংলার রেডিয়ো কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ১৯৪১ সালের ১১ অক্টোবর বাংলায় ১৫ মিনিটের সাপ্তাহিক সম্প্রচারের মধ্য দিয়ে। পরে ১৯৬৫ সালে সংবাদ প্রচার শুরু হয়।

বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ৩২৮টি পদ শূন্য করার মাধ্যমে ২ কোটি ৮৫ লাখ পাউন্ড সাশ্রয়ের প্রস্তাব রেখেছে। অন্যদিকে বছরে ৫০ কোটি পাউন্ড সাশ্রয়ে সিবিবিসি ও বিবিসি ফোরের কার্যক্রমকেও অনলাইনভিত্তিক করে তোলা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের রেডিয়ো, টিভি ও ডিজিটাল কার্যক্রম রয়েছে। সপ্তাহে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩৬ কোটি ৪০ লাখ মানুষর কাছে পৌঁছায় বিবিসি। এখন এর অর্ধেকই আসে অনলাইন থেকে।

বিশ্বব্যাপী ইংরেজি খবর পরিবেশন অব্যাহত থাকবে বলে জানা গেছে। (সূত্র: ১ অক্টোবর ২০২২, কালের কণ্ঠ)

শোক সংবাদ

তোয়াব খান

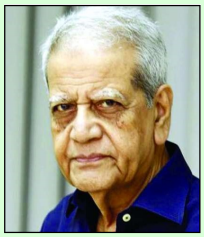

দৈনিক বাংলার সম্পাদক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত বর্ষীয়ান সাংবাদিক বীর মুক্তিযোদ্ধা তোয়াব খান (৮৮) আর নেই। দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত জটিলতায় ভুগে ১ অক্টোবর রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ৩ অক্টোবর রাজধানীর বনানী কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

১৯৩৪ সালের ২৪ এপ্রিল সাতক্ষীরার রসুলপুর গ্রামে তোয়াব খানের জন্ম। ১৯৫৩ সালে সাপ্তাহিক জনতার মাধ্যমে সাংবাদিকতাজীবন শুরু। তবে তাঁর দীর্ঘ, ঘটনাবহুল ও সৃজনশীল সাংবাদিকতাজীবনের সূচনা হয়েছিল ১৯৫৫ সালে দৈনিক সংবাদে। ১৯৬১ সালে তিনি দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক হন। এর পর ১৯৬৪ সালে যোগ দেন দৈনিক পাকিস্তানে। দেশ স্বাধীনের পর দৈনিক পাকিস্তান থেকে বদলে যাওয়া দৈনিক বাংলার প্রথম সম্পাদক ছিলেন তোয়াব খান। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। সে সময় তাঁর আকর্ষণীয় উপস্থাপনায় নিয়মিত প্রচারিত হয় 'পিন্ডির প্রলাপ' নামে অনুষ্ঠান। ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি তিনি দৈনিক বাংলার সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব ছিলেন। আশির দশকে রাষ্ট্রপতি এইচএম এরশাদ এবং ১৯৯১ সালে অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের প্রেস সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) মহাপরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন তিনি। ১৯৯৩ সালে

দৈনিক জনকণ্ঠের শুরু থেকে গত বছরের অক্টোবর পর্যন্ত পত্রিকাটির উপদেষ্টা সম্পাদক ছিলেন। এরপর তিনি নিউজবাংলা এবং নতুন আঙ্গিক ও ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত দৈনিক বাংলার সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। ২০১৬ সালে তোয়াব খান একুশে পদকে ভূষিত হন।

সাংবাদিকতা পেশাজীবনের শুরু থেকেই তোয়াব খান সাংবাদিকতায় নতুনত্ব, আধুনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার উজ্জ্বল এবং অনুকরণীয় প্রমাণ রেখেছেন। তিনি এ দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতায় অনন্য একটি প্রতিষ্ঠান। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত বহু প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান সাংবাদিকের প্রতিভা লালন ও বিকাশে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। সাংবাদিকতার মাধ্যমে অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন ও অবিচল সংগ্রামী তোয়াব খান পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে চাকরিচ্যুত এবং কারা নির্যাতনও ভোগ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'ফিরে দেখা আজ এবং কাল'।

এনামুল হক

বাংলাদেশ বেতারের প্রথম মহাপরিচালক (ডিজি) এনামুল হক (৯৩) ইন্তেকাল করেছেন। ২৮ সেপ্টেম্বর রাতে নগরীর ইউনাইটেড হাসপাতালে এই প্রবীণ সাংবাদিক ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক হন। দুই বছর পর তাঁকে প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টের (পিআইডি) দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৮০ সালে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে তিনি প্রেস মিনিস্টার হিসাবে নিয়োগ পান। ১৯৮২ সালে লন্ডন থেকে ঢাকায় ফিরে রেডিয়ো ও টেলিভিশনকে একত্র করে ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং অথরিটির (NBA) ডাইরেক্টর জেনারেল এবং চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দুই বছর পর আবার দিল্লি বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রেস মিনিস্টার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে তিনি ১৯৮৬ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন। পরে সরকারের কন্ট্রাক্ট বেসিসে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও ডিএফপির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নিউ নেশন পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বহু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকাশনার জন্য শত শত নিবন্ধ লিখেছেন। তাকে বারিধারা জে ব্লকের একটি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

রণেশ মৈত্র

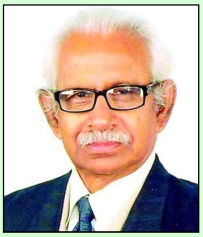

ভাষাসংগ্রামী, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক, পাবনা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও কলামিস্ট রণেশ মৈত্রের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর সদর মহাশ্মশানে তাকে দাহ করা হয়েছে। এর আগে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান শেষে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তার মরদেহ নেওয়া হয় প্রেস ক্লাব চত্বরে। সেখানে তাকে শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় সিক্ত করেন সাংবাদিক, সামাজিক-রাজনৈতিক নেতাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। ১৯৩৩ সালের ৪ অক্টোবর রাজশাহীর নওহাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আজীবন সংগ্রামী রণেশ মৈত্র। ২৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর একটি হাসপাতালে ৯০ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

অমিত হাবিব

দৈনিক দেশ রূপান্তরের সম্পাদক অমিত হাবিব (৫৯) আর নেই। ২৮ জুলাই রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

২১ জুলাই কর্মস্থলে অমিত হাবিব অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে স্কয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাঁকে বিআরবি হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) রাখা হয়। ২৫ জুলাই তাঁকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অমিত হাবিব ১৯৬৩ সালের ২৩ অক্টোবর ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার কাজির বেড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যশোর এমএম কলেজ থেকে ১৯৮০ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন তিনি। তখন থেকে লেখালেখিতে যুক্ত হন। সেসময় বিচিত্রা, পূর্বাভাস, প্রিয় প্রজন্ম পত্রিকা এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত নাটক, অনুষ্ঠানের সমালোচনা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখে বেশ জনপ্রিয়তা পান।

পরে তিনি সাপ্তাহিক পূর্বাভাস, দৈনিক আজকের কাগজ ও দৈনিক ভোরের কাগজে কাজ করেছেন। ২০০৩ সালে দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকায় প্রধান বার্তা সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন খ্যাতিমান এই সাংবাদিক। দৈনিক সমকালের প্রধান বার্তা সম্পাদক হিসাবেও কাজ করেছেন। পরে দৈনিক কালের কণ্ঠে নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে উপদেষ্টা সম্পাদক হন। ২০১৮ সালে তিনি দৈনিক দেশ রূপান্তর পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নেন।

বাংলামোটরে দেশ রূপান্তর কার্যালয়ে অমিত হাবিবের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর লাশ নেওয়া হয় জাতীয় প্রেস ক্লাবে। সেখানে জানাজা শেষে মরদেহ ঝিনাইদহে নেওয়া হয়।

সোহানা পারভীন তুলি

সাংবাদিক সোহানা পারভীন তুলির মৃতদেহের ময়নাতদন্ত ১৪ জুলাই শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ মর্গে সম্পন্ন হয়েছে। পরে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক জানান, মৃতের গলায় দড়ির দাগ পাওয়া গেছে। এছাড়া অন্য কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

১৩ জুলাই রাজধানীর রায়েরবাজারের শেরেবাংলা রোডের বাসা থেকে সাংবাদিক সোহানা পারভীনের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় তার ভাই মোহাইমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে হাজারীবাগ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু (ইউডি) মামলা করেছেন।

এদিকে ১৪ জুলাই সন্ধ্যায় যশোর সদর উপজেলার বকচর জামে মসজিদসংলগ্ন হুঁশতলা কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। এর আগে নিজ এলাকায় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

গত বছরের মে পর্যন্ত বাংলা ট্রিবিউনে জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক হিসাবে কর্মরত ছিলেন সোহানা। এর আগে তিনি কালের কণ্ঠ ও আমাদের সময় পত্রিকায় কাজ করেছেন।

সৈয়দ আবদুল মতিন

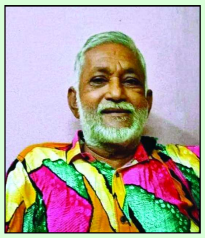

খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি, প্রবীণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আবদুল মতিন (৬৮) ৩০ জুন নগরীর শহিদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। দীর্ঘদিন তিনি নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন। বাদ জোহর জানাজা শেষে নগরীর বসুপাড়া কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

সৈয়দ আবদুল মতিন বাংলাদেশ বেতারের নাট্যপরিচালক, গীতিকার ও আবৃত্তিশিল্পী ছিলেন। বেতারের খুলনা কেন্দ্র থেকে পরিচালিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'চাষাবাদ'-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

এসএম মোজাম্মেল হক

রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার পদ্মা বড়াল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ও চারঘাট প্রেস ক্লাবের সভাপতি এসএম মোজাম্মেল হক (৬০) আর নেই। তিনি ১৮ জুলাই ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের চারঘাট সংবাদদাতা ও চারঘাট মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক।

সুভাষ চৌধুরী

বসুন্ধরা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত সাংবাদিক সুভাষ চৌধুরী (৭৪) ২০ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরার কাটিয়া ধোপাপুকুর এলাকার নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সাতক্ষীরা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সুভাষ চৌধুরী মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দৈনিক যুগান্তর ও এনটিভির সাতক্ষীরা প্রতিনিধি হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য ৩০ মে বসুন্ধরা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন এই প্রবীণ সাংবাদিক। হার্ট, কিডনিসহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক মাস ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন সুভাষ চৌধুরী। রসুলপুর শ্মশানে তার শেষকৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

পারভীন আখতার

দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদনা সহকারী পারভীন আখতার (৪৯) ৩ অক্টোবর বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)।

পারভীন আখতার ছিলেন মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার বাঁশকান্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম আবদুল মান্নান শিকদারের কন্যা। ৪ অক্টোবর বাদ জোহর গ্রামের বাড়ি শিবচরের বাজিতপুরে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

খান এ রাজ্জাক

সমকালের কুয়াকাটা প্রতিনিধি খান এ রাজ্জাক (৪৭) ১ ডিসেম্বর মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। একই সঙ্গে তিনি কুয়াকাটা খানাবাদ ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। এছাড়া তিনি কুয়াকাটা প্রেস ক্লাবের সদস্যসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খান এ রাজ্জাক হঠাৎ অসুস্থবোধ করেন। তাকে দ্রুত কুয়াকাটা হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খান এ রাজ্জাককে শেষবারের মতো দেখতে মরদেহ কর্মস্থল কুয়াকাটা খানাবাদ ডিগ্রি কলেজ মাঠে রাখা হয় এবং সেখানেই তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

সৈয়দ আসাদুজ্জামান বাচ্চু

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য সৈয়দ আসাদুজ্জামান বাচ্চু (৮২) আর নেই। ৩০ অক্টোবর রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। এদিন বাদ মাগরিব বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার বড়ো মসজিদে জানাজা শেষে আজিমপুর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

১৯৪০ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণকারী সৈয়দ আসাদুজ্জামান বাচ্চু স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে দৈনিক পয়গাম ও আজাদের বার্তা সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইউএসআইএস-এ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত কলাম লিখতেন তিনি।

প্রদীপ কুমার দে

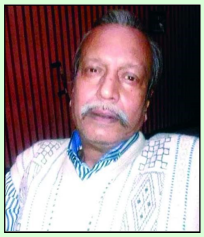

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য, অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক চিত্রালীর সহকারী সম্পাদক প্রদীপ কুমার দে (হীরেন দে) ১৯ নভেম্বর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। গাইবান্ধার গ্রামের বাড়িতে তার মরদেহ দাহ করা হয়।

এসএম আতিকুর রহমান

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সদস্য প্রবীণ সাংবাদিক এসএম আতিকুর রহমান (৭০) ৩০ অক্টোবর ঢাকার একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। তিনি দৈনিক সত্যবাণীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। ৩১ অক্টোবর প্রথম জানাজা চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। কক্সবাজার জেলার চকরিয়ার পূর্ব বড়ো ভেওলা শামসু মিয়া বাজারের বড়ো মসজিদ মাঠে দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

একেএম গোলাম কবির

খ্যাতিমান চলচ্চিত্র প্রদর্শক, ষাটের দশকের ছাত্রনেতা, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী এবং

সোনাইমুড়ির কোটবাড়িয়ার একেএম গোলাম কবির (৮২) ১ নভেম্বর সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি মওলানা ভাসানীর একনিষ্ঠ অনুসারী, ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পরবর্তী সময়ে ইউপিপির সহসভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ সালে তার নিজেস্ব উদ্যোগে বঙ্গবার্তা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি নিজ এলাকায় অনেক শিক্ষাসহ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

ওমর ফারুক বিশাল

কর্মস্থলে যাওয়ার সময় কাভার্ডভ্যানের চাকায় পিষ্ট হয়েছেন সাংবাদিক ও গীতিকার ওমর ফারুক বিশাল। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত বিশালের বাড়ি উপজেলার আমলাব ইউনিয়নের ধুকুন্দি গ্রামে। তিনি জি নিউজ২৪ ডটকমের যুগ্ম বার্তা-সম্পাদক ও বাংলাদেশ গীতিকবি সংগঠনের সদস্য ছিলেন। এর আগে তিনি দৈনিক সমকাল, বাংলাদেশ প্রতিদিন, যায়যায়দিন পত্রিকা ও বাংলানিউজ২৪ ডটকমে সহসম্পাদক হিসাবে কাজ করেন।

মাসুম আজিজ

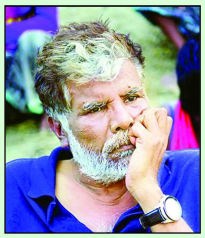

একুশে পদক পাওয়া অভিনেতা, নাট্যকার ও নির্দেশক মাসুম আজিজ (৭০) আর নেই। ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ১৭ অক্টোবর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)।

মঞ্চ, টিভি ও চলচ্চিত্র–তিন মাধ্যমেই তিনি অভিনয় করেছেন। নির্যাতিত, খেটে খাওয়া ও দুঃখী মানুষের চরিত্রে তিনি সুনিপুণ অভিনয় করে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি মঞ্চনাটকে প্রথম অভিনয় করেন। ১৯৮৫ সালে প্রথম টিভি নাটকে অভিনয় করেন। হুমায়ূন আহমেদ, মামুনুর রশীদ, সালাহউদ্দিন লাভলুসহ অনেক পরিচালকের নাটকেই তিনি অভিনয় করেছেন। মামুনুর রশীদের 'সময় অসময়' নাটকে অভিনয় করে তিনি জনপ্রিয়তা পান। ২০০৬ সালে কাজী মোরশেদের 'ঘানি' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব-অভিনেতার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। 'গহীনে শব্দ', 'এই তো প্রেম', 'রূপগাওয়াল', 'গাড়িওয়ালা', 'আমরা একটি সিনেমা বানাব'সহ বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। সরকারি অনুদানে চলচ্চিত্র 'সনাতন গল্প' পরিচালনাও করেছেন। এ বছরই একুশে পদক পেয়েছেন মাসুম আজিজ। মঞ্চে তার রচনা ও নির্দেশনায় সর্বশেষ নাটক 'ট্রায়াল অব সূর্য সেন', ঢাকা পদাতিকের নিয়মিত প্রযোজনা এটি।

দীর্ঘদিন ধরে হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন মাসুম আজিজ। ২০১৭ সালে তার হার্টে চারটি ব্লক ধরা পড়ে। অস্ত্রোপচারের পর সুস্থও হয়ে ওঠেন। এ বছরের শুরুতে তার ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়ে। এর পর থেকেই হাসপাতাল ও বাসা করে কেটে যায় তার জীবনের শেষ কয়েকটা দিন। ১৩ অক্টোবর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে স্কয়ার হাসপাতালের 'লাইফ সাপোর্টে' নেওয়া হয়। সেখান থেকে আর ফেরেননি।

রায়হান এম চৌধুরী

ইংরেজি দৈনিক দ্য ফিন্যানশিয়াল এক্সপ্রেসের বিজনেস এডিটর রায়হান এম চৌধুরী (৫৭) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ২২ অক্টোবর রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রায়হান চৌধুরী ১৯৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনপ্রশাসনে অনার্স এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এশার নামাজের পর ঢাকার শান্তিনগরে নিজ বাসভবনের সামনে আরেকবার জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

মাহবুবুল হক খান বাদল

ঢাকার দোহার-নবাবগঞ্জ উপজেলার দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক সংবাদদাতা মাহবুবুল হক খান বাদল (৬৮) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ফুসফুস ক্যানসারে ভুগছিলেন। দুই মাস ধরে রাজধানীর কাকরাইলে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২১ নভেম্বর ইন্তেকাল করেন। নবাবগঞ্জ সদর শহিদমিনার চত্বরে তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে বাদ জোহর দ্বিতীয় জানাজা শেষে আলগীচর সামাজিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

বিক্রমজিৎ বর্ধন

মৌলভীবাজার-শ্রীমঙ্গল সড়কের মোকামবাজার এলাকায় মোটরসাইকেলের ওপর গাছ পড়ে বেসরকারি বাংলা টিভির প্রতিনিধি বিক্রমজিৎ বর্ধন (৫০) মারা গেছেন। ১১ নভেম্বর তিনি মৌলভীবাজার শহর থেকে ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে গিয়াসনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রাস্তার পাশে অবৈধভাবে গাছ কাটার সময় গাছটি সড়কে তার মোটরসাইকেলের ওপর পড়ে।

মৌলভীবাজার মডেল থানার ওসি মো. ইয়াসিনুল হক জানান, বিক্রমজিৎ বর্ধন ছেলেকে নিয়ে মোটরসাইকেলে শ্রীমঙ্গল যাচ্ছিলেন। মোকামবাজারে পৌঁছালে রাস্তার পাশে কাটা গাছ পড়ে তিনি নিহত হন।

বিশ্বাস সিরাজুল হক পান্না

টুঙ্গিপাড়া প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সমকালের উপজেলা প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা বিশ্বাস সিরাজুল হক পান্না (৭৪) ১ ডিসেম্বর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে সৌদি আরবে ওমরাহ পালনরত অবস্থায়

ইন্তেকাল করেছেন (ইনালিল্লাহি...রাজিউন)। বাদ জুমা মক্কা শরিফে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে স্থানীয় জান্নাতুল মোয়াল্লায় তার লাশ দাফন করা হয়। সিরাজুল হক পান্না ১৯৪৮ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার গিমাডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মৌলবি আবদুল বারী বিশ্বাস ও মা রাবেয়া বেগম।

আবীর হাসান

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আবীর হাসান (৬৩) করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ৭ জুলাই রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। করোনায় আক্রান্ত ছাড়াও তিনি দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন।

আবীর হাসান একাধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, অনুবাদক ও কবি ছিলেন। কৈশোরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি তিনি বিদেশি সাংবাদিকদের 'গাইড' হিসাবে কাজ করেছেন। তারুণ্যে ফিলিস্তিন, চাদ, পূর্ব তিমুর, ফিজিতে কখনো যোদ্ধা, কখনো সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেছেন আবীর হাসান।

জ্যেষ্ঠ এই সাংবাদিক কাজ করেছেন সাবেক নভোস্তি প্রেস, বর্তমান রয়টার্সের সঙ্গেও। সর্বশেষ তিনি রেডিয়ো আমার-এর হেড অব নিউজ ছিলেন। বাদ জোহর রাজধানীর গ্রিন রোডের বাসার কাছে মসজিদে জানাজা শেষে বিকালে গাজীপুরে নিজ বাড়িতে তার লাশ দাফন করা হয়।

কেএম রুবেল

বৈশাখী টেলিভিশন ও দৈনিক সংবাদের ফরিদপুর জেলা প্রতিনিধি কাজী তৈয়াবুর রহমান (৪৭) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে ফরিদপুরের ডায়াবেটিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। স্থানীয় বায়তুল আমান ঈদগাহ ময়দানে জানাজা শেষে বিলমাহমুদপুর আরামবাগ কবরস্থানে তার লাশ দফন করা হয়। কেএম রুবেল ফরিদপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক ও খেলাঘর ফরিদপুর জেলা শাখার বর্তমান কমিটির সদস্য ছিলেন।

শর্মিলী আহমেদ

মঞ্চ, টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রের বরেণ্য অভিনয়শিল্পী শর্মিলী আহমেদ (৭৫) আর নেই। ৮ জুলাই নিজ বাসায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। দীর্ঘদিন ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চলছিল কেমোথেরাপি। কিছুদিন আগে নিয়েছিলেন শেষ কেমোও।

শর্মিলী আহমেদের প্রকৃত নাম মাজেদা মল্লিক। তার জন্ম ১৯৪৭ সালের ৮ মে মুর্শিদাবাদের বেলুরচাক গ্রামে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পাশ করেন।

১৯৬২ সালে মাত্র চার বছর বয়সে রাজশাহী বেতারে প্রথম অভিনয় শুরু করেন শর্মিলী আহমেদ। পরে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে আসেন। ষাটের দশকে চলচ্চিত্রাঙ্গনে নাম লেখান শর্মিলী আহমেদ। শর্মিলী আহমেদ অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র 'ঠিকানা' (উর্দু ভাষায় নির্মিত) মুক্তি পায়নি। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে আরও কিছু উর্দু ছবিতেও তিনি অভিনয় করেন। স্বাধীনতার পর আয়না ও অবশিষ্ট, আবির্ভাব, সুয়োরাণী দুয়োরাণী, পানছি বাওড়া, পলাতক, আলিঙ্গন, রূপালী সৈকতে, আগুন, বসুন্ধরা, আরাধনা, আশার আলো, এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী, রাই বিনোদিনী, নির্দোষ, হিসাব নিকাশ, প্রেমিক, দুই নয়ন, সুদ আসল, দহন, ডানপিটে ছেলে, স্বর্গ নরকসহ আরও অনেক ছবিতে ছিল তার অনবদ্য উপস্থিতি। এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ টিভি নাটক এবং ১৫০ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয়-জীবনে মায়ের চরিত্রে এত বেশি অভিনয় করেছেন যে বিনোদন অঙ্গনে তিনি সবার কাছে মা হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। সবাই তাকে শর্মিলী মা বলেই ডাকতেন।

৮ জুলাই বাদ আসর রাজধানী উত্তরার মসজিদে শর্মিলী আহমেদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে বনানী কবরস্থানে স্বামীর কবরে তাকে সমাহিত করা হয়।

জঁ লুক গদার

বিশ্ব চলচ্চিত্রে আরও এক নক্ষত্রের পতন। চলে গেলেন কিংবদন্তি ফরাসি নির্মাতা জঁ লুক গদার। ১৩ সেপ্টেম্বর সুইজারল্যান্ডের রোলে নিজ বাড়িতে ৯১ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন তিনি।

ফরাসি নবকল্লোল চলচ্চিত্র আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা জঁ লুক গদার। তার হাত ধরে সিনেমা পেয়েছে ভিন্নধারা ও ভাষা। তার সিনেমায় উঠে এসেছে সমাজের প্রকৃত চিত্র। তবে শুধু সিনেমার পর্দায়ই নয়; তার লেখনীতেও ফুটে উঠেছে সমাজের নানা দিকের কথা। গদারের চলচ্চিত্রে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ স্পষ্ট। তিনি ঐতিহ্যগত সিনেমার ফর্ম ভেঙে দেন। ষাটের দশকের নবকল্লোল চলচ্চিত্র আন্দোলনের সূচনা হয় তার হাত ধরে। তাই সিনেমাবোদ্ধারা তাকে তার কালের সেরা চলচ্চিত্র পরিচালক বলেন।

সাত দশকের ক্যারিয়ারে দর্শকদের ম্যাস্কুলিন ফেমিনিন, দ্য লিটল সোলজার, মেইড ইন ইউএসএ, উইকএন্ড, পাইরট লে ফু, লা পেটিট সোলদাদ, ইন প্যারিস অব লাভ, দ্য কারাবিনারস, দ্য ইমেজ বুক, অল দ্য বয়েজ আর কল্ড প্যাট্রিক-এর মতো কালজয়ী সিনেমা উপহার দিয়েছেন গদার।

১৯৩০ সালের ৩ ডিসেম্বর প্যারিসে জন্ম গদারের। শৈশব কেটেছে প্যারিস ও সুইজারল্যান্ডে। ছোটোবেলায় শিল্পী হতে চেয়েছিলেন। তারুণ্যে চলচ্চিত্র নিয়ে সাময়িকীতে নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেন। পঞ্চাশের দশকে চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৬০ সালে মুক্তি পায় তার নির্মিত প্রথম ফিচার ফিল্ম 'ব্রেথলেস'। মুক্তির পর চলচ্চিত্রটি বিশ্বের নজরে পড়ে। প্রথম চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই বুঝিয়ে দেন তিনি সিনেমায় নতুন ভাষার জন্ম দিয়েছেন। তখনই নির্মাতারা পান নতুন এক শব্দ–'জাম্প কাট'। এটি চলচ্চিত্রে গল্প বলার ধরনকেই আমূল বদলে দিয়েছিল।

২০০২ সালে ব্রিটিশ চলচ্চিত্র সাময়িকী 'সাইট অ্যান্ড সাউন্ড'-এর জরিপে সর্বকালের সেরা ১০ নির্মাতার মধ্যে জায়গা করে নেন গদার। ২০১০ সালে একাডেমি অ্যাওয়ার্ডে সম্মানসূচক পুরস্কার দেওয়া হয় তাকে। ২০১৮ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে তার সিনেমা 'ইমেজ বুক' বিশেষ পুরস্কার পায়। ২০১৪ সালে তার সিনেমা 'গুডবাই' কান চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি পুরস্কার পায়।

টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশ-এর সদস্যদের জন্য মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার

দেশে তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের একক কৃতিত্ব শেখ হাসিনার

—মোস্তাফা জব্বার

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে এবং টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশ (টিএমজিবি)-এর সহযোগিতায় টিএমজিবির সদস্যদের নিয়ে মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক তিনদিনব্যাপী (২-৪ সেপ্টেম্বর) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশের তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের একক কৃতিত্ব শেখ হাসিনার। প্রযুক্তির বিবর্তনের ফলে সাংবাদিকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকদের প্রযুক্তিগত দক্ষ করে গড়ে তুলতে অনলাইন সাংবাদিকতার গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশে সাংবাদিকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের বিকল্প নেই। গুজব প্রতিরোধে মোবাইল সাংবাদিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন তিনি। সমাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিআইবির উপপরিচালক (প্রশাসন, চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন। পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক নাসিমূল আহসানের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

সাংবাদিকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের বিকল্প নেই

—জুনাইদ আহমেদ পলক

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে এবং টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশ (টিএমজিবি)-এর সহযোগিতায় টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশের সদস্যদের নিয়ে

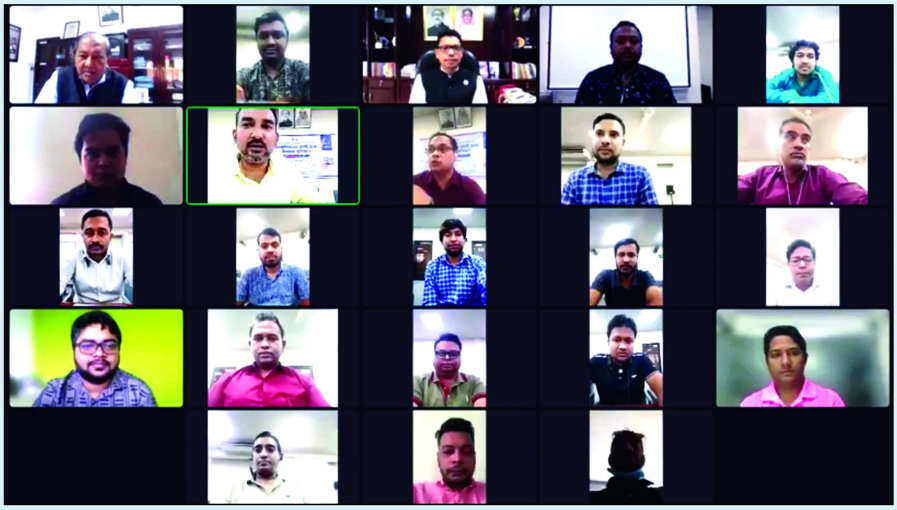

টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশ-এর সদস্যদের মাঝে ফ্যাক্ট চেকবিষয়ক প্রশিক্ষণ সমাপন অনুষ্ঠানে অনলাইনে বক্তব্য দিচ্ছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি

সাংবাদিকতায় ফ্যাক্ট চেকবিষয়ক তিনদিনব্যাপী (২৮-৩০ অক্টোবর) প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে অনলাইনে যুক্ত হন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যমগুলো আমরা সাধারণত তথ্যের জন্য ব্যবহার করি। তিনি ভুয়া নিউজ বা ফেক নিউজ না বলে মিস ইনফরমেশন বলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সাংবাদিকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রযুক্তির সঙ্গে আধুনিক বিশ্বে তাল মিলিয়ে চলতে ফ্যাক্ট চেকের ব্যাপ্তি বেড়েছে। অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে (পিআইবি) শেখ রাসেল ডিজিটাল আইটি ল্যাব স্থাপনের আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে সনদ বিতরণ করেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের ফলে গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। একে প্রতিরোধ করা এখন সময়ের দাবি।

পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক নাসিমূল আহসানের সমন্বয়ে টিএমজিবির সাধারণ সম্পাদক মুরসালিন হক জুনায়েদের সঞ্চালনায় প্রশিক্ষণে ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

আলীকদম ও লামার সাংবাদিকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বান্দরবান জেলার আলীকদম ও লামা উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (৯-১১ অক্টোবর) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ১১ অক্টোবর লামা পৌরসভা মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে সনদ বিতরণ করেন লামা পৌরসভার মেয়র জহিরুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে দুই উপজেলার ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রামের ৬ উপজেলার সাংবাদিকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

চট্টগ্রামের ৬ উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১০-১২ অক্টোবর) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ১২ অক্টোবর সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন সাতকানিয়া-চন্দনাইশের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাতেমা-তুজ-জোহরা। সাতকানিয়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে কর্মশালায় সাতকানিয়া, চন্দনাইশ, লোহাগাড়া, আনোয়ারা বাঁশখালী ও বোয়ালখালী উপজেলার ২৯ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ২২ অক্টোবর শনিবার প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে (পিআইবি) অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তি কমিটির সভাপতি এবং পিআইবির মহাপরিচালক ও প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জাফর ওয়াজেদ উপস্থিত ছিলেন। ভর্তি কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন পিআইবির উপপরিচালক (প্রশাসন, চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন, সহকারী অধ্যাপক পংকজ কর্মকার, প্রভাষক লাজিনা আক্তার জ্যাসলিন ও সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের সমন্বয়কারী প্রভাষক শুভ কর্মকার।

চট্টগ্রাম জেলার ৬ উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন সাতকানিয়া-চন্দনাইশের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সদস্যদের জন্য ফ্যাক্ট চেকবিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান অতিথি হিসাবে সনদ বিতরণ করেন প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মো. শাহেনুর মিয়া

ফ্যাক্ট চেকবিষয়ক তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সদস্যদের জন্য ফ্যাক্ট চেকবিষয়ক তিনদিনব্যাপী (২৫-২৭ অক্টোবর) প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ২৭ অক্টোবর পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মো. শাহেনুর মিয়া। অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান ছিলেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৩৫ জন সাংবাদিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ক্রীড়াঙ্গন সমৃদ্ধির কৃতিত্ব শেখ হাসিনার

–ড. বীরেন শিকদার এমপি

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ক্রীড়া বিটের সাংবাদিকদের জন্য রিপোর্টিংয়ের মানোন্নয়নে তিনদিনব্যাপী (২-৪ আগস্ট) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ৪ আগস্ট পিআইবির সেমিনার কক্ষে সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. বীরেন শিকদার এমপি। তিনি বলেন, দেশের ক্রীড়াঙ্গন সমৃদ্ধির কৃতিত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। তাছাড়া দেশের ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বে তুলে ধরতে খেলোয়াড়দের পাশাপাশি ক্রীড়া সাংবাদিকদেরও ভূমিকা রয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, ক্রীড়া সাংবাদিকের সবচেয়ে বড়ো যোগ্যতা হলো কম শব্দে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন তৈরি করা। একমাত্র বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনই পারে পাঠক ও দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে। সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান। পিআইবির কনিষ্ঠ প্রশিক্ষক মোহাম্মদ শাহ আলমের সমন্বয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৩৩ জন ক্রীড়া সাংবাদিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রামে বুনিয়াদি এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (৯-১১ আগস্ট) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠান ১১ আগস্ট বিকালে পটিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। পটিয়া আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তনে প্রশিক্ষণ দুটির সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ শামসুল হক চৌধুরী। বিশেষ অতিথি পটিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরী। পিআইবির সিনিয়র প্রশিক্ষক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদের সমন্বয়ে চট্টগ্রামের পটিয়া, বোয়ালখালী, চন্দনাইশ, কর্ণফুলী ও আনোয়ারা উপজেলার ৭০ জন সাংবাদিক প্রশিক্ষণ দুটিতে অংশগ্রহণ করেন।

সিলেটে বুনিয়াদি এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ

সিলেটের গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, কানাইঘাট ও জৈন্তাপুর উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১৮-২০ আগস্ট) দুটি প্রশিক্ষণ জৈন্তাপুর উপজেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয়। চার উপজেলার ৭০ জন গণমাধ্যমকর্মী বুনিয়াদি এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণে অংশ নেন। জৈন্তাপুর উপজেলা সদরে অবস্থিত সাইট্রাস গবেষণাকেন্দ্র অডিটোরিয়ামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে জৈন্তাপুর উপজেলা চেয়ারম্যান কামাল আহমেদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আল-বশিরুল ইসলাম, এসি ল্যান্ড রিপামণি দেবী, সাইট্রাস গবেষণকেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ঝুটন চন্দ্র সরকার এবং জৈন্তাপুর প্রেস ক্লাব সভাপতি নূরুল ইসলাম বক্তব্য দেন। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান। প্রশিক্ষণ শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সনদ বিতরণ করা হয়।

পিআইবিতে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী এবং ১৫ আগস্টের শহিদদের স্মরণে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ আগস্ট পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিলে মূল আলোচক ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। আলোচনায় তিনি বলেন, ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে যারা, তাদের খুঁজে বের করতে তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে। এ সময় তিনি জাতির পিতাসহ সব শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন। পরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পিআইবির সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং বিষয়ে তিনদিনব্যাপী (১৭-১৯ জুলাই) প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসাবে প্রশিক্ষণের

খুলনা জেলার রূপসা-তেরখাদা ও বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার সাংবাদিকদের নিয়ে তিনদিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, এমপি

উদ্‌বোধন করেন জেলা প্রশাসক মো. শাহগীর আলম। পিআইবির সিনিয়র প্রশিক্ষক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান। বক্তব্য দেন স্থানীয় প্রেস ক্লাব সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন জামী ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ রহিম বিজন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাংবাদিকবান্ধব রাজনীতিবিদ

–হাবিবুন নাহার

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে খুলনা জেলার রূপসা, তেরখাদা এবং বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২৫-২৭ জুলাই) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) শেষ হয়েছে। পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাগেরহাট-৩ আসনের সংসদ সদস্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাংবাদিকবান্ধব রাজনীতিক। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সাংবাদিকরা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে স্বাধীনতার জন্য বাংলার জনগণকে সংগঠিত করতে সহায়তা করেছিলেন। তিনি বলেন, সাংবাদিকতা একটি উত্তম পেশা। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাংবাদিকদের সচেতনতা সৃষ্টিতে এগিয়ে আসতে হবে। সাংবাদিকরা জাতির কণ্ঠস্বর। দেশের যে কোনো ক্রান্তিকালে সাংবাদিকদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। সমাপন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান। পিআইবির সিনিয়র প্রশিক্ষক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত নাটোর জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে নাটোরের ২৮ জন সাংবাদিক অংশ নেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. ফারুক আহমেদ প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। সমাপন অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন।

পিআইবিতে সংবাদ সম্পাদনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের (ডিএসইসি) সদস্যদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২৫-২৭ জুলাই) সংবাদ সম্পাদনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তর সম্পাদক সাইফুল আলম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, একটি নিখুঁত ও নির্ভুল সংবাদপত্রের মূল কারিকর হলেন সাব-এডিটর। গুণগতমান ও পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী পত্রিকাকে তুলে ধরতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তারা। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, সাব-এডিটর হলেন একটি পত্রিকার

ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে সংবাদ সম্পাদনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান অতিথি হিসাবে সনদ বিতরণ করেন দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক সাইফুল আলম

পিআইবি'র ই-লার্নিং প্ল্যাটফরমের ২৯ জন শিক্ষার্থীকে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ করেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জসীম উদ্দিন

প্রাণ। সাব-এডিটরদের যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। সমাপন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান। প্রশিক্ষণে ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবির ই-লার্নিং শিক্ষার্থীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর ই-লার্নিং প্ল্যাটফরমের শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকার ২০ জন এবং ঢাকার বাইরের ৯ জনসহ ২৯ জন সাংবাদিককে তাদের পেশার মানোন্নয়নে তিনদিনব্যাপী (২৯-৩১ জুলাই) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পিআইবির সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জসীম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। সমাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান। পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক ই-লার্নিং সমন্বয়ক নাসিমুল আহসানের সমন্বয়ে ও ই-লার্নিং ম্যানেজার শিপন মীরের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণে ২৯ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ডিআরইউ-এর লাইব্রেরিতে পিআইবির বই উপহার

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর প্রকাশিত বই উপহার হিসাবে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠু ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম হাসিবের কাছে হস্তান্তর করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) কবি কাজী নজরুল ইসলাম লাইব্রেরিতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বই প্রদান সম্পন্ন হয়। এ সময় পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, ডিআরইউর লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও সাংবাদিকতাসংশ্লিষ্ট ৫৬ কপি বিভিন্ন ধরনের বই ও গবেষণামূলক বই দেওয়া হলো। পর্যায়ক্রমে এই লাইব্রেরিকে আরও বই উপহার হিসাবে দেওয়া হবে বলে জানান পিআইবির মহাপরিচালক।

বই হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর প্রকাশনা বিভাগের সহকারী সম্পাদক দুলাল কৃষ্ণ আচার্য, সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিন, প্রতিবেদক এমএম নাজমুল হাসান ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) বিভিন্ন পর্যায়ের সাংবাদিক।

পিআইবির শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর তিনজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার এবং ২৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ গ্রেডভিত্তিক সম্মানি দেওয়া হয়েছে। ৬ সেপ্টেম্বর পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জনগণের সেবক মনে করে তাদের দায়িত্ব পালন করতে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি জাতীয় নীতিমালা মেনে সবাইকে অফিস করার পরামর্শের পাশাপাশি, বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিদ্যুৎ, পানিসহ অন্যান্য দৈনন্দিন ব্যবহৃত বিষয়গুলোর ব্যবহার সংকোচনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময় পিআইবির মহাপরিচালক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা ২০২১ মোতাবেক তিনজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর হাতে শুদ্ধাচার পুরস্কার তুলে দেন।

পিআইবিতে চবিসাফ-এর সাংবাদিকদের অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে তিনদিনব্যাপী (১-৩ নভেম্বর) চট্টগ্রাম বিভাগ সাংবাদিক ফোরাম-ঢাকা (চবিসাফ)-এর সদস্যদের নিয়ে সাংবাদিকতায় অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পিআইবির পক্ষ থেকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) লাইব্রেরিতে বই প্রদান অনুষ্ঠানে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ ও ডিআরইউ নেতারা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ শেষে সাংবাদিকদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার এবং গণমাধ্যমকর্মীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে এবং অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সচেতনতামূলক দুইদিনব্যাপী (৭-৮ নভেম্বর) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু (এমপি)। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, প্রতিবন্ধিতা কোনো অভিশাপ নয়, বরং জিনগত ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন সমস্যার কারণে সৃষ্ট। প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সচেতনতার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন তিনি। বিশেষ অতিথি হিসাবে যুগ্মসচিব, এটুআই প্রকল্প পরিচালক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবির প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ওপর আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রযাত্রা মসৃণ করতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত ও সামাজিক বৈষম্যে দূরীকরণে কুসংস্কার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রতিবেদন ও ফিচার তৈরির ওপর জোর দেন।

পিআইবির কনিষ্ঠ প্রশিক্ষক শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। এতে এটুআই-এর প্রোগ্রাম রিসোর্স পারসন হিসাবে ভাস্কর ভট্টাচার্য, এমএম তরিকুল হক ও দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিবেদক রাবেয়া বেবী উপস্থিত ছিলেন।

পিআইবিতে পিজেএফ-এর মোবাইল সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ঢাকাস্থ পটুয়াখালী জার্নালিস্টস ফোরামের (পিজেএফ) সদস্যদের জন্য (১৪-১৫ নভেম্বর) দুইদিনব্যাপী মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইংরেজি দৈনিক বাংলাদেশ এক্সপ্রেসের সম্পাদক ফারুক আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, মোবাইল জার্নালিজম বা মোবাইল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার জানা গুরুত্বপূর্ণ। পেশাগত মানোন্নয়নে মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন তিনি।

পিআইবির সিনিয়র প্রশিক্ষক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ঢাকাস্থ পটুয়াখালী জার্নালিস্টস ফোরামের (পিজেএফ) সদস্যভুক্ত ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। এতে পিজেএফ-এর সভাপতি মো. সহিদুল ইসলাম রানা ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন রাসেল উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকাস্থ পটুয়াখালী জার্নালিস্ট ফোরামের সদস্যদের জন্য মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

সংবাদপত্রে নারী পাতাবিষয়ক কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

পিআইবিতে সংবাদপত্রে নারী পাতাবিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১৮ নভেম্বর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে 'দৈনিক পত্রিকার নারী পাতাবিষয়ক কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালার মডারেটর পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও গণমাধ্যম হাউজগুলোর ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে জেন্ডারবৈষম্য বিলোপ করা সম্ভব। এ সময় তিনি পত্রিকার নারী পাতায় নারীবান্ধব ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন।

আলোচনায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সিনিয়র রিপোর্টার শাহনাজ সোমা, দৈনিক জনকণ্ঠের নারী পাতার বিভাগীয় সম্পাদক নাজনীন বেগম, দৈনিক ইত্তেফাকের নারী পাতা সম্পাদক রাবেয়া বেবী, পিআইবির গবেষক এনায়েত হোসেন রেজা, দৈনিক কালবেলার নারী পাতাবিষয়ক সম্পাদক রিতা ভৌমিক, যুগান্তরের নারীপাতা 'সুরঞ্জনার' সম্পাদক ইমন চৌধুরী, দৈনিক আমাদের সময়ের লাবণ্য লিপি, সমকালের সাদিয়া ইসলাম পারুল, আজকের পত্রিকার মন্টি বৈষ্ণব, ভোরের কাগজের মরিয়ম সেজুতি, সারা বাংলা ডটকমের রাজনীন ফারজানাসহ ৩৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের সদস্যদের দুইদিনব্যাপী (১৬-১৭ নভেম্বর) প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ১৭ নভেম্বর পিআইবির সেমিনার কক্ষে সমাপন অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান হিসাবে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক নাসিমূল আহসানের সমন্বয়ে ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের সভাপতি মামুন ফরাজী ও সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসান হৃদয় উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে একই সময়ে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য পিআইবির সেমিনার কক্ষে দুইদিনব্যাপী অপর একটি বুনিয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। পিআইবির প্রশিক্ষক পারভীন সুলতানা রাব্বীর সমন্বয়ে দুই উপজেলার ৩০ জন সাংবাদিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

সিরাজগঞ্জ জেলার সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়া

পিআইবিতে সিরাজগঞ্জ জেলা ও ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

২১ নভেম্বর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সিরাজগঞ্জ জেলার সাংবাদিকদের দুইদিনব্যাপী (২০-২১ নভেম্বর) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়া বলেন, নিজে সমৃদ্ধ না হলে বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব নয়।

অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন বা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ের গুরুত্ব সব সময় একই থাকে। অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে একজন প্রতিবেদককে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, তার কৌশল ও করণীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। পিআইবির কনিষ্ঠ প্রশিক্ষক মো. শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে সিরাজগঞ্জ জেলার ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

এদিকে একই দিন ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের সাংবাদিকদের জন্য পিআইবির সেমিনার কক্ষে অপর একটি সংবাদ সম্পাদনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। সমাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুভাষ চন্দ বাদল প্রধান অতিথি এবং পিআইবির

কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম ও নাঙ্গলকোট উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জসীম উদ্দিন

মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ সভাপ্রধান হিসাবে প্রশিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন। পিআইবির প্রশিক্ষক পারভীন সুলতানা রাব্বীর সমন্বয়ে ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের ৩৫ জন সাংবাদিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

চৌদ্দগ্রাম ও নাঙ্গলকোটের সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

২৪ নভেম্বর পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম ও নাঙ্গলকোট উপজেলার সাংবাদিকদের দুইদিনব্যাপী (২৩-২৪) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জসীম উদ্দিন।

তিনি বলেন, শুধু নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক সংবাদ অনুসন্ধান করাও একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্ব। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ের জন্য প্রতিবেদককে চৌকশ ও ধীর মস্তিষ্কসম্পন্ন হতে হবে। পিআইবির সিনিয়র গবেষক শেখ মজলিশ ফুয়াদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম ও নাঙ্গলকোট উপজেলার ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বরুড়া-চান্দিনা উপজেলার সাংবাদিকদের আবাসিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

পিআইবিতে কুমিল্লার বরুড়া ও চান্দিনা উপজেলার সাংবাদিকদের দুইদিনব্যাপী (২৫-২৬ নভেম্বর) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) সম্পন্ন হয়েছে। ২৬ নভেম্বর সমাপন অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন কুমিল্লা-৭ আসনের সংসদ সদস্য প্রাণ গোপাল দত্ত। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় সাংবাদিকদের সহযোগিতা জরুরি।

পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি সাংবাদিকদের রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যতম অংশীজন হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম সম্পর্কিত ন্যূনতম জ্ঞান না থাকলে ভালো প্রতিবেদন তৈরি করা দুরূহ বলে মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বেসিক জ্ঞান না থাকলে প্রতিবেদন সাবলীল ও বস্তুনিষ্ঠ হয় না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিআইবির প্রকাশনা বিভাগের সহকারী সম্পাদক দুলাল কৃষ্ণ আচার্য। পিআইবির কনিষ্ঠ প্রশিক্ষক মোহাম্মদ শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে কুমিল্লার বরুড়া ও চান্দিনা উপজেলার ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) আয়োজনে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া ও কাশিয়ানী উপজেলার সাংবাদিকদের দুইদিনব্যাপী (২৭-২৮ নভেম্বর) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং (আবাসিক) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৮ নভেম্বর পিআইবির সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মুহা. সাইফুল্লাহ অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনই গণমাধ্যমের বিশেষত্ব বলে মন্তব্য করেছেন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রতিবেদককে ধীর

কুমিল্লার বরুড়া ও চান্দিনা উপজেলার সাংবাদিকদের দুইদিনব্যাপী সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া ও কাশিয়ানী উপজেলার সাংবাদিকদের নিয়ে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মুহা. সাইফুল্লাহ

মস্তিষ্কসম্পন্ন হতে হবে। পিআইবির প্রশিক্ষক পারভীন সুলতানা রাব্বীর সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও কাশিয়ানী উপজেলার ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে গোলটেবিল বৈঠক
গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপন আর জেন্ডার সমতা ভিন্ন বিষয়

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে ১ ডিসেম্বর 'গণমাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক সংবাদ উপস্থাপন পর্যবেক্ষণের ফলাফল' বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্ট (SACMID) ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর যৌথ আয়োজনে এবং ফ্রি প্রেস আনলিমিটেড ও প্রটেকটিং ইনডিপেনডেন্ট মিডিয়া ফর এফেক্টিভ ডেভেলপমেন্ট (PRIMED)-এর সহযোগিতায় এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

গোলটেবিল বৈঠকের মডারেটর পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, নারী আগের চেয়ে বেশি সক্ষমতা অর্জন করেছেন। তারা এখন কেবল রান্নাবান্না ও সন্তান প্রতিপালন করা থেকে বের হয়ে সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করছেন। নারী উদ্যোক্তা ও অগ্রগামী হওয়ার ফলে সমাজ থেকে অনেক বৈষম্য দূর করা সম্ভব হয়েছে। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গীতি আরা নাসরিন পিআইবি থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত তার 'জেন্ডার ও গণমাধ্যম নির্দেশক' বইয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোকপাত করেন। গোলটেবিল বৈঠকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মিনহাজ উদ্দিন, বাংলাভিশনের সিনিয়র বার্তা সম্পাদক রুহুল আমিন রুশদ, চ্যানেল আইয়ের সিনিয়র নিউজ এডিটর মীর মাশরুর জামান, দৈনিক প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি মানসুরা হোসেন, দৈনিক কালবেলার বিশেষ প্রতিনিধি আঙ্গুর নাহার মন্টি, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সিনিয়র প্রতিবেদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য শাহনাজ সিদ্দিকী সোমা, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন বাংলাদেশের প্রজেক্ট অফিসার শিরিন আহসান মৌ প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

গোলটেবিল বৈঠকে সংবাদকর্মী, বিশেষজ্ঞ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক, গবেষকসহ ২৩ জন অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে SACMID-এর পক্ষে 'গণমাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক সংবাদ উপস্থাপন পর্যবেক্ষণের ফলাফল উপস্থাপন করেন সাইদুল ইসলাম। SACMID-এর উপপরিচালক সৈয়দ কামরুল হাসান ও পিআইবির কনিষ্ঠ প্রশিক্ষক মোহাম্মদ শাহ আলম সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন।

বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়ার সাংবাদিকদের মোবাইল সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে কুমিল্লার বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য দুইদিনের (২ ও ৩ ডিসেম্বর) প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাংবাদিক, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ও শিশুসাহিত্যিক মোস্তফা হোসেইন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি মোবাইল সাংবাদিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি মোবাইল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অডিয়ো, ভিডিয়ো এবং ভিজুয়ালের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের তাগিদ দেন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্য দেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। পিআইবির কনিষ্ঠ প্রশিক্ষক মোহাম্মদ শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে কুমিল্লার বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে ফ্যাক্ট চেক ও অনুসন্ধানমূলক দুটি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে নারী সাংবাদিকদের জন্য দুইদিনের (৬ ও ৭ ডিসেম্বর) প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ৭ নভেম্বর পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) প্রধান বার্তা সম্পাদক সমীর কান্তি বড়ুয়া। তিনি বলেন, সাংবাদিকতার উৎকর্ষসাধনে ফ্যাক্ট চেকিংয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ ফ্যাক্ট চেক ও সাংবাদিকতার নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক সমিতির (বানাসাস) সদস্য ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

এদিকে একই দিন মাদারীপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য পিআইবির অপর সেমিনার কক্ষে দুইদিনের অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং আবাসিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। কর্মশালায় ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের সভাপতি মামুন ফরাজী উপস্থিত ছিলেন।